উন্নয়ন : দু'একটি প্রশ্ন পৃষ্ঠা ৩

হালফিল কাশ্মীর আন্দোলন পৃষ্ঠা ৬

কাশ্মীরে গণতন্ত্র হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে পৃষ্ঠা ৮

সাক্ষাৎকার :

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কোন পথে পৃষ্ঠা ১০

কাশ্মীর : এক সমাধানহীন সমস্যা পৃষ্ঠা ১২

পশ্চিমবঙ্গের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কি আর গরিব নয়? পৃষ্ঠা ১৪

বাতিল শ্রমিক পৃষ্ঠা ১৭

উপসাগরে তেল ছলকিয়ে পড়ল —— পৃথিবীর গায়ে ফাটল পৃষ্ঠা ২০

বিষ মিশছে জলে পৃষ্ঠা ২

জুলাই-আগস্ট ২০১০ ❐ একাদশ বর্ষ ❐ চতুর্থ সংখ্যা ❐ ৬ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

হম কেয়া চাহতে? আজাদি

কাশ্মীরের মানুষ কী চায়, তারা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে গত ষাট বছরে বলতে পেরেছে। তবু প্রতিবছর একবার ভারতীয় বাহিনীর বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝরা হতে হতে সেই কথাটা তাদের পুনরুচ্চারণ করতে হয়। আর প্রত্যেকবার কাশ্মীরকে নির্বিচারে দমন করার পর মিডিয়ায় তাদের প্রতি দিল্লি থেকে সমবেদনা জানানো হয়। এবছরও প্রধানমন্ত্রী চোস্ত উর্দুতে কাশ্মীরিদের জানিয়েছেন : তিনি কাশ্মীরিদের জন্য কতটা শোকাহত; তিনি মানছেন জঙ্গি আন্দোলনকে কাশ্মীরিরা বর্জন করেছে; তিনি বোঝেন আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নিয়ে কাশ্মীরিরা কতটা ক্ষুব্ধ; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে সংলাপ ও মীমাংসাই জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একমাত্র পথ; ইত্যাদি ইত্যাদি ...

অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সমেত এতাবৎ সমস্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীরা একবারের জন্যও কাশ্মীরিদের অন্তরের চাহিদাকে উচ্চারণ করতে চাননি। কারণ সেই তিন অক্ষরের শব্দটাকে নিয়েই তাঁদের যাবতীয় আতঙ্ক। এই আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কমপক্ষে সত্তর হাজার (অন্য হিসেব মতো এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) কাশ্মীরির জীবন নিয়েছেন; কয়েক লক্ষ বন্দুকধারী মোতায়েন করে কাশ্মীরকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছেন। জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে অজস্র মিথ্যার ফুলঝুরি ছড়িয়ে একটা ছোট্ট সত্যকে আড়াল করতে চেয়েছেন। কিন্তু সত্য বারবার পাহাড়ের গলি-বস্তি ছাপিয়ে রাজপথে এসে হাজির হয়েছে; ভারতীয় মূলস্রোত-রাজনীতিবিদদের হৃৎকম্পন বাড়িয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা, একটা বাস্তব সত্যকে স্বীকার না করে কি কোন সংলাপ সম্ভব? যদি সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার হাজার অসুবিধাও থাকে, তাহলেও তাকে চাপা দিয়ে কখনও কোন মীমাংসা হয় কি? দিল্লির শাসকেরা কি এই সহজ কথাটা জানে না? নিশ্চয় তারা জানে। তাই সংলাপ বা আলোচনার কথাটার মধ্যেও রয়েছে আর এক চাতুরি; নিজেদের গণতান্ত্রিক দেখানোর একটা ছল মাত্র।

তাহলে কি কাশ্মীরের জন্য ভারতের দিক থেকে কোন সমাধান নেই? এবারের মন্থনের কাশ্মীর সংক্রান্ত লেখা ও সাক্ষাৎকারে সেই নির্মম সত্যটাই উঠে এসেছে।

এরকম বেশ কিছু নির্মম সত্য এই মুহূর্তে আমাদের গলার কাঁটা হয়ে আছে। চাল, ডাল বা মাছ-সবজির বাজারের কথাটাই ধরা যাক। আমরা রোজ দুর্ভোগ পোয়াচ্ছি। এক বিপুল জনসমষ্টির দিনভর খেটেও পেটপুরে খাবার জোগাড় করার সাধ্য থাকছে না। তবু এর সমাধান আমাদের চালু রাজনীতির বাইরে।

সমুদ্রে তেল ছলকিয়ে পড়ে পরিবেশ-প্রকৃতির কী কাণ্ডটাই না হয়ে চলেছে। অথচ আমরা কি বলতে পারছি, মোটরগাড়ির ব্যবহার যথাসাধ্য কমিয়ে দেব? মোটেই তা পারছি না। তাই কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে আমাদের সমুদ্র-গর্ভ খুঁড়ে তেল তুলতেই হবে। এই অবস্থাকে মেনে কী আলোচনা হবে? কীসের মীমাংসা হবে?

আসলে আমরা আজ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাসের দ্বারা পরাধীন। কাশ্মীরিরা এক ধরনের পরাধীনতার জ্বালা ভোগ করছে। আমরাও অন্য এক পরাধীনতায় মরছি।

হম কেয়া চাহতে? আজাদি।

বিপি এবং মেক্সিকো উপসাগরে তেল নির্গমন প্রসঙ্গ

একশ বছরেরও বেশি পুরনো আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানি বিপি। পুরনো ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির নাম থেকে এখনকার নাম বিপি। বিশ্বের ৮০টির বেশি দেশে ব্যবসায় লিপ্ত পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম কোম্পানি বিপি। এর সদর দপ্তর লন্ডনে হলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো তেল ও ন্যাচারাল গ্যাসের উৎপাদক বিপি আমেরিকা, যার সদর দপ্তর টেক্সাসের হাউস্টনে। এবছরের ২০ এপ্রিল মেক্সিকো উপসাগরে বিপি-র ডিপওয়াটার হরাইজন রিগ-এর বিস্ফোরণ ঘটে। ১৫ জুলাই কূপের মাথায় ঢাকনা লাগিয়ে ছিদ্রটা বন্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে ৪৯০ লক্ষ ব্যারেল অশোধিত তেল সমুদ্রে নির্গত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনাকে পেট্রোলিয়াম শিল্পের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক তেল নির্গমনের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমুদ্রে তেল নির্গমনের মতো বিপর্যয় কোন নতুন ঘটনা নয়। সম্প্রতি মুম্বইয়ের জহরলাল নেহরু বন্দর থেকে মাত্র পাঁচ কিমি দূরে এমএসসি চিত্রা নামে এক মালবাহী জাহাজের সঙ্গে এমভি খালিজিয়া-থ্রি জাহাজের ধাক্কা লেগে প্রথম জাহাজটি ৭০ ডিগ্রি টাল খেয়ে যায়। ওই জাহাজের ৮টি জ্বালানি ভর্তি ট্যাঙ্কের দু'টি থেকে প্রায় ৮০০ টন তেল আরব সাগরে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ২৫ বর্গ কিমি এলাকায় ওই তেল ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া ওই জাহাজের ১২১৯টি কন্টেনারের মধ্যে ৩১টিতে কীটনাশক জাতীয় বিষাক্ত রাসায়নিক ছিল। তা থেকেও জলজ বিভিন্ন প্রজাতির দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই ধরনের বিপর্যয়ের বহুমাত্রিক ফলাফল অনুধাবন করার জন্য আমরা এই সংখ্যায় ঈশিতা কুণ্ডুর এই ছোট্ট লেখাটি ছাড়াও 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ২১ জুন ২০১০-এ প্রকাশিত নাওমি ক্লেইন-এর **Gulf oil spill : A hole in the world** *প্রবন্ধটি বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশ করছি। সেটি রয়েছে ২০ পৃষ্ঠায়। তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।*

বিষ মিশছে জলে

ঈশিতা কুণ্ডু

পেট্রোলিয়াম শিল্পের ইতিহাসে খনিজ তেল উত্তোলনের সময় সমুদ্রের বুকে বিস্ফোরণ কোন নতুন ঘটনা নয়। বরঞ্চ তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই কিছুটা পরিমাণে এই বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেইদিক থেকে বিচার করলে ২০ এপ্রিল ২০১০ আমেরিকায় মেক্সিকো সাগরের উপকূলে তেল উত্তোলনজনিত দুর্ঘটনাটি আলাদা করে বিস্ময় জাগায় না। কিন্তু যদি এই দুর্ঘটনা হয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত? যদি শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে প্রাণ হারাতে হয় সাধারণ শ্রমিককে? সাম্রাজ্যবাদের এই স্বর্ণযুগে যদি পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে সাধারণ নাগরিকদের জীবন নিয়ে খেলা করতে মেতে ওঠে এবং অবশ্যম্ভাবী বিপদের কথা জেনেও চোখ বন্ধ করে থাকে পুঁজিবাদের দালালরা?

২০ এপ্রিলের দুর্ঘটনার সংবাদ দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেলকূপের মালিক বিপি-র সিইও টনি হেওয়ার্ডের মতে, "ওইসময় ব্লো আউট প্রিভেন্টর (যা আসন্ন বিপদের সতর্কবার্তা দিতে সক্ষম) বিকল হয়ে থাকার জন্যই আমরা দুর্ঘটনার কোন আভাষ দিতে পারিনি এবং প্রয়োজন মতো সতর্কতা জারি করাও সম্ভব হয়নি।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই বক্তব্যের সত্যতা কতখানি? গত ১১ আগস্ট ২০১০ 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা হয়েছে যে, এই দুর্ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে কোম্পানি শ্রমিকদের মধ্যে একটি গোপন সমীক্ষা করিয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল যে শ্রমিকদের অনেকেই কোম্পানির সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদিতে খুশি নয়। এমনকী নানা সভায় তারা তেলের খনিগুলিতে বেশ কিছু আপত্তিকর পরিবর্তনও লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয়ে কেউই মুখ খুলতে পারেনি।

এর থেকে কোম্পানি সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যত্ন নিতে সেই খাতে ঠিক কতটা তৎপর ছিল, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রয়োজনীয় সকল প্রকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও এখন পর্যন্ত তেলের কুপ্রভাব তেমনভাবে কমতে দেখা যায়নি। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এবং সরকারের আপৎকালীন বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী তেলের দূষণ রোধ করার জন্য যথেচ্ছে পরিমাণ 'কেমিকাল ডিসপারসান্ট' ব্যবহার করা হয়েছে; ফলে জলে ভাসমান তেল টুকরো টুকরো খণ্ডে রয়েছে। মধ্যবর্তী ফাঁকা অঞ্চলে জলজ প্রাণীরা কিছুটা আশ্বস্ত হলেও এই কেমিকাল ডিসপারসান্ট অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করলে তা নানাভাবে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাছাড়াও, সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় হাজার ব্যারেল (১৫৯০০ লিটার) তেল সমুদ্রে মিশছে (বেসরকারি মতে তেল নির্গমনের পরিমাণ চারগুণ বেশি)। ক্রমশ এই তেল উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির প্রাত্যহিক জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যাহত করছে।

এক্ষেত্রে পাঠকের জেনে রাখা প্রয়োজন, এই ভাসমান তেল থেকে নানাপ্রকার বিপদের এবং বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। একথা আজ কোনভাবেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। প্রথমত, এই ভাসমান তেল থেকে আগুন লেগে যেতে পারে; দ্বিতীয়ত, এই পরিমাণ তেল জলে কোনরকম অক্সিজেন দ্রবীভূত হতে দেয় না। ফলে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে। তৃতীয়ত, এই তেলের বিষক্রিয়ার ফলে বাতাসে, জলে এবং মাটিতে নানাভাবে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের পক্ষে হানিকর।

এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিপি কোম্পানি ওই বিকল ব্লো আউট প্রিভেন্টরটিকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পাঠকদের মনে রাখতে হবে, এই যন্ত্রটি কিন্তু এর আগে কোন সংকেত দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, শুধুমাত্র সক্রিয় করা ছাড়াও যন্ত্রটিকে যথাযথ কাজের উপযোগী করে তুলতে হবে অথবা সম্পূর্ণ পালটাতে হবে।

এছাড়াও, পরিবেশ ও সমগ্র মানবসমাজকে এইরকম বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে সরকারি, বেসরকারি, রাষ্ট্রীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জৈব গ্যাস ও সেই জাতীয় পদার্থের ব্যবহার অনেক বাড়াতে হবে। পরিকাঠামো আরও অনেক উন্নত করতে হবে। নতুবা এইপ্রকার ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

উন্নয়ন : দু-একটি প্রশ্ন

সৌরীন ভট্টাচার্য

নীলাঞ্জন দত্ত সম্পাদিত এবং শ্রেয়া পাবলিকেশন দ্বারা প্রকাশিত 'বিয়ন্ড ডেভলপমেন্টালিজম' বা 'উন্নয়নবাদ পেরিয়ে' নামক প্রবন্ধ সংকলন থেকে নেওয়া সৌরীন ভট্টাচার্যের লেখা এই প্রবন্ধটির নাম 'ডিসার্নিং ডেভলপমেন্ট — কোয়েশ্চেনস উই বোল্ডলি নীড টু আস্ক'। অনুবাদ করেছেন তমাল ভৌমিক।

উন্নয়ন শব্দটার মধ্যে একটা জাদুস্পর্শ বা ম্যাজিক আছে। হ্যাঁ, এই ভাবেই শব্দটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের আলোচনায়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ও বিতর্কগুলিতে, সর্বত্র। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলো যখন একে অপরের বিরুদ্ধে যুক্তির তুবড়ি ছোটাচ্ছে তখন দলমত নির্বিশেষে সব পক্ষই ওই একই কথা বলছে। উন্নয়নের নামে শপথ নিচ্ছে সব দলই। অভিজাত ড্রইংরুমের গুরুগম্ভীর সান্ধ্য আলোচনা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে ট্রেনে-বাসে চলতে ফিরতে পাঁচজনের উচ্চকিত মন্তব্যে সর্বক্ষেত্রে উপসংহার ওই একটাই, 'উন্নয়ন কতটা জরুরি'। উন্নয়নের প্রকল্প, তা শুরু করার প্রচেষ্টা যেই নিয়ে থাকুক না কেন, তাকে সমর্থন করার জন্য আমাদের বিবেকের সাড়া যেন নিঃশব্দে তৈরি হয়েই গেছে। এই সাড়া খুব জোরদার হয় যখন 'আমরা' ওই প্রকল্প শুরু করি আর 'ওরা' শুরু করলে একটু কম হয়। আমাদের এখানে উন্নয়নের সমস্ত বয়ানটাই এমন দাঁড়াচ্ছে যে ভাবনাচিন্তার স্তরে কোনও বোধবুদ্ধিই কাজ করছে বলে মনে হয় না, আর প্রয়োগের বেলায় মনে হচ্ছে যেন গায়ের জোরই একমাত্র কথা।

এখানে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে উন্নয়ন ব্যাপারটাই মূলত ভালো জীবন যাপনের জন্য। ভালো সামাজিক জীবনের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার একটা বেশ দীর্ঘ ইতিহাস আমরা খুঁজে পেতে পারি। এবং তা অবশ্যই সন্ন্যাসীর জীবন নয়। একথা ঠিক যে আমাদের বাঁচার জন্য কিছু জিনিসপত্রের দরকার। সেইসব জিনিসের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ আমাদেরকে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোয় বেঁধে ফেলে। এই সম্পর্কগুলো অনেকসময় ব্যক্তিগত ও অনেকসময় গোষ্ঠীগত। আমরা জানি আমাদেরকে অন্যদের সঙ্গে বাঁচতে হবে এবং নানারকম তফাৎ নিয়েই জীবনযাপন শিখতে হবে। এই পার্থক্যগুলো নানা স্বার্থের সংঘাত ও বিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এখান থেকেই আমাদের মনে ভালো রাজনৈতিক সংগঠন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠে আসে। ভালো জীবনের প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই ভালো সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও সামাজিক শৃঙ্খলার সম্পর্ক রয়েছে। উন্নয়নের প্রশ্নও তাই সামাজিক প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা যায় না। এগুলো প্রকৃত সামাজিক বিষয়।

উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ভালো জীবনের জন্যই। কিন্তু ন্যায্যতা, সততা, সাম্য, সুপ্রশাসন, দায়িত্বশীল নাগরিক জীবন ইত্যাদি ভালো জীবনের অন্যান্য যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোর থেকে উন্নয়ন ধারণাগত ভাবে ভিন্ন বিষয়। ভিন্ন কিন্তু সম্ভবত সম্পর্কহীন নয়। প্রাচীনরা যা যা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তার মধ্যে এই বিষয়গুলো ছিল এবং এর সবগুলো না হলেও কতকগুলো আধুনিক সময়েও মাথা ঘামানোর বিষয় হিসেবে রয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে আজকের ভালো জীবনের জন্য আরও কতকগুলো জরুরি বিষয় হাজির হয়েছে — যার মধ্যে রয়েছে শান্তি, পরিবেশ, মানবাধিকার, স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতিবৈষম্য, দারিদ্র্য, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরোধ, ধর্মের রাজনীতিকরণ ও হিংসা। অতএব সাধারণভাবে ভালো সামাজিক জীবন বলতে আমরা যা বোঝাই তার ধারণাটা অনেক বিস্তৃত। আজকে উন্নয়নের নামে যা চলছে তা এই বিস্তৃত ধারণার একটা রূপ এবং অবশ্যই একটা সংকীর্ণ রূপ।

সুতরাং, উন্নয়নের প্রেক্ষিতকে একটা ভালো সামাজিক জীবনের প্রেক্ষিত থেকে অনেক দূরে তুলে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাডাম স্মিথের ভাবনায় বৃদ্ধি বা উন্নয়ন বা অন্য কোনও কিছুই এমন টুকরো টুকরো করে আসেনি। তাঁর লক্ষ্যে ছিল এক সুস্থ নাগরিক জীবন। বৃদ্ধির অর্থনীতি বা উন্নয়নের অর্থনীতির বিশেষ বিদ্যাক্ষেত্রগুলো তখনও হাজির হয়নি। এগুলো এসেছে আরও অনেকটা পরে। মাঝে মাঝে এমন কথা ওঠে যে বহুকাল ধরে যে তথ্যাবলী ও জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে তারই মধ্য থেকে এইসব বিশেষ ক্ষেত্র, নানা বিষয়ের নানা শাখা প্রশাখা ও শিক্ষার বিভিন্ন উপধারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবশ্যই সত্যি। আর ভোগ্যবস্তুর এত বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটেছে যে এগুলোর দিকে তাকিয়ে সমগ্রকে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। তাহলে, আদিতে যে ক্ষেত্রটা বিবেচনাধীন ছিল তার মাত্র কতকগুলো দিকেই একজনের মনোনিবেশ করা বাধ্যতা মূলক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা তো সবটা নয়। তাই একজনকে একটা সময়ে সমস্যার একটা দিকেই মনোযোগ দিতে হবে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য সমস্ত দিকগুলো সম্পর্কে তার মনটাকে খোলা রাখতে হবে, যাতে ওই সমস্ত অন্য দিকগুলো যে তথ্যাদি জানাচ্ছে তা গ্রহণ করার জন্য মন প্রস্তুত থাকে। যে পদ্ধতিগত অবস্থান থেকে বিবেচ্য সমস্যার নানা দিকের কতকগুলোকে অনেকসময়ই অপ্রাসঙ্গিক বলে ধরা হয়, তার থেকে এই অবস্থান একেবারেই আলাদা। এর একটা আদর্শ নমুনা হল কোন একটা বিশেষ অবস্থার অর্থনৈতিক দিকগুলোর আলোচনার সময়ে তথাকথিত রাজনৈতিক বিবেচনাগুলি একপাশে ঠিক করে রাখা। এই ভাগাভাগিকে প্রায়শই কোনও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার সীমা নামক বন্ধন দিয়ে এক ধরনের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সীমারেখাগুলো কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে চাপিয়ে দেওয়া মাত্র।

উন্নয়নের আলোচনায় আমাদের একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে রাখা দরকার যে উন্নয়ন কিন্তু বৃদ্ধির ব্যাপার নয়। বৃদ্ধি হচ্ছে মূলত পরিমাণগত এবং উন্নয়ন হচ্ছে গুণগত বিষয়। কেউ বৃদ্ধি পায় এবং বিশাল হয়, বড়ো হয়। কিন্তু কারো উন্নয়ন হওয়া মানে সম্ভবত আরও ভালো হওয়া, আরও সহনশীল হওয়া বা আরও উপকারী হওয়া। এগুলো স্পষ্টতই গুণগত বিষয়। একটা অতিবৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতি সবসময় যথেষ্টভাবে সকলকে জড়িয়ে নিয়ে গড়ে ওঠে না। এমনকী, কোথাও নয় শতাংশ বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্রচুর নিঃস্ব মানুষকেও পেয়ে যাবেন। এটাকে আমরা আদৌ একটা উন্নত রাষ্ট্র বলে নাও ধরতে পারি এই সহজ কারণে যে এখানে আমরা দেখলাম যে এই ব্যবস্থাটা সকলকে নিয়ে মিলে মিশে থাকে নি। এই যে সবাইকে নিয়ে মিলে মিশে থাকা বা সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে একসঙ্গে থাকা, এই ধারণাটাকেই সহজে ভালো থাকার ধারণার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। ভালো থাকা কথাটার বস্তুগত অর্থেই এ ধারণাটাকে ভাবা যেতে পারে এবং তা সমাজ সমগ্রের জন্যও প্রযোজ্য।

এখানেই সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলির প্রশ্ন চলে আসে। এমন একটা সামাজিক ব্যবস্থা থাকতে পারে যেখানে সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশ উচ্চশিক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সঠিক ও মোটামুটি ন্যায্য দামে পেতে পারে। আবার অন্য একটা ব্যবস্থায় সমাজের অন্য একটা অংশ ওই সবগুলোকেই সুবিধামতো পেতে পারে। অতএব উন্নয়নের নামে

যা চলে তা সবার জন্য সমান নয় এবং তা সমাজের বিভিন্ন অংশের পছন্দের সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে চলে না। এখান থেকেই বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্গটিকে রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্দ্ধে বলে কোনও ভান দেখানোর দরকার নেই। কারণ স্পষ্টতই এটা তা নয়।

আমাদের প্রয়োজন সাহস করে এরকম সব প্রশ্ন তোলা : কী ধরনের উন্নয়ন? কাদের জন্য? কেমনভাবে এবং কখন? এবং কতদিন ধরে? এগুলো অবশ্যই জটিল প্রশ্ন। বর্তমানে এগুলোর সোজাসাপ্টা উত্তর অবশ্য কিছু দেওয়া হচ্ছে। এই উত্তরগুলো আদতে দেওয়া হচ্ছে পুঁজির পক্ষে, যদিও এমন করে এগুলোকে পরিবেশন করা হচ্ছে যে দেখে মনে হচ্ছে এগুলোর কোনও ক্ষতিকারক দিক নেই। পুঁজির সঙ্গে এগুলোর যে কোনও সম্পর্ক আছে তা চাপা দেওয়ার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। উন্নয়নের যে ধারণা আজ শাসকের ভূমিকায় তা আসলে বৃদ্ধির ধারণা। এবং তা হচ্ছে আরও আরও ভোগ্যদ্রব্য তৈরি করা, কী ধরনের ভোগ্য দ্রব্য তা কোনও ব্যাপার নয়, কারা সেগুলো ভোগ করবে তাও কোন ব্যাপার নয়। এইভাবে যা আমরা এখানে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখতে পেয়েছি তা হল বর্তমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেকগুলোতেই নতুন যে ধনিক শ্রেণী গজিয়ে উঠেছে তারা যেমন যেমন ভোগ করতে পারে সেই সব ক্ষেত্রেই পুঁজি নজর দিয়েছে যাতে সেখানে আরও ভোগ্যদ্রব্য ও পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা যায়। এর ফলেই জনসাধারণের এক অংশের জন্য সস্তার ছোটো যাত্রীগাড়ি ও আর এক অংশের জন্য জাগুয়ার বা এরকম ধরনের নামী গাড়ি বানানো নিয়ে এত হৈচৈ। আমাদের সমাজগুলোর নানা কোণে কোণে নতুন ক্রয়ক্ষমতা সঞ্চিত এবং প্রতিটা কোণ থেকে সেগুলোকে সযত্নে ঝেড়েপুঁছে তুলে নিতে হবে। এটাই নতুন পুঁজির কন্ঠস্বর এবং তার আওয়াজ ছড়াতে শুরু করেছে সোভিয়েত নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে।

এটা মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে বর্তমান বিশ্বায়নের জোয়ার অভ্রান্তভাবে ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থা অবশ্যই গতি পেয়েছে এবং তার ফলেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। সারা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে পুঁজির 'লং মার্চ' চলছে। এই পুঁজি ক্রমশঃ নতুন নতুন ক্ষেত্রকে গ্রাস করছে। এবং এই সমস্তকেই উন্নয়নের নামে উপস্থিত করা হয়েছে, যদিও বর্তমান তথ্য অনুযায়ী ৭৩ কোটি লোক ক্ষুধার্ত এবং বেশ কিছু জায়গায় প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ উপবাসের বিপজ্জনক মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে শোনা যায়।

সত্যিই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে এই উন্নয়নের জমানায়। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের দেশেরই বিভিন্ন শহরে আইপিএল ক্রিকেট ম্যাচের লম্বা আসর বসেছে। এর মধ্যে বিশাল টাকার খেলা, যে টাকার রঙ সবসময় যে খুব সাদা নয় এটা যে কেউ সন্দেহ করতে পারে (তৃতীয় আইপিএল কাণ্ড এই প্রবন্ধের পরবর্তী ঘটনা)। যে কেউ অনুমান করতে পারে যে ওই টাকা আরও অনেক খারাপ টাকার জন্ম দেবে। এমনকী এই আসরগুলোকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য এবং এগুলো যাতে আরও মানুষকে টেনে আনতে পারে তার জন্য এর সঙ্গে আশ্চর্য সব নাচা-গানা আমোদ-প্রমোদ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইসব বিশাল ধামাকাগুলো কতদিন টিকবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। এগুলোর তেমন কোন দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ না থাকলেও যে গরমাগরম পুঁজি খেলার এই নতুন কায়দার সংস্করণে উদারভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার জন্য এগুলো স্বল্পমেয়াদী কিছু টাকা বানানোর ব্যবস্থা করতেই পারে। এর মধ্যে যৌনতা নিয়ে নৈতিক প্রশ্ন উঠে গেছে। কিন্তু তা বাদ দিয়েও অন্য ধরনের নৈতিক প্রশ্নও জোর দিয়ে তোলা উচিত। সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক নৈতিকতার প্রশ্ন। এইসব খেলা ও আসরগুলো মূলত সন্ধ্যাবেলায় কৃত্রিম আলো বা ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে হয়। কিছুই অবাক করার মতো নয়। ভারতীয় গ্রীষ্ম দিনের বেলা ক্রিকেটের জন্য মোটেই আদর্শ ঋতু নয়, এবং একই কারণে ওর সঙ্গে যেসব নাচা গানা চালু হয়েছে তাও করা সম্ভব নয়। আজকের তীব্র বিদ্যুৎ সঙ্কটের দিনগুলোতে বিশাল ক্রিকেট মাঠ জুড়ে দিনের বেলার মতো উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করতে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করাটা, অগ্রাধিকারের যে বিকৃত বোধ চারিদিক গিলে ফেলেছে তারই একটা লক্ষণ। বিশ্বায়িত পুঁজি এই ধরনের বিকৃতবোধের মধ্যে দিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

বিশ্বায়ন এক ধরনের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের মডেলকে আইনত গ্রাহ্য করতে চায়, কিন্তু তা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েনি, এমনটা নয়। এর বিরোধিতা হয়েছে অবশ্যই নানা কায়দায়, নানা আকারে ও নানারকমের ভাষায়। সিয়াটেল থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ওপর একবার চোখ বোলালেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো সরল হিসেবে সমপ্রকৃতির না হলেও, এগুলো নিঃসন্দেহে বিকল্পের ঐকান্তিক সন্ধানের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

এখনও অনেকে আছে যারা মনে করে যে বিকল্প এমন কিছু করা নিশ্চয়ই সম্ভব যাতে পৃথিবীর মানুষ আরেকটু সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকাটা শিখতে পারে। আমাদের জীবনকে এমনভাবে সংগঠিত করা উচিত যাতে, যাদের স্বচ্ছলতা আছে (শুধুমাত্র বাজারের অঙ্কে) তারা যেন হৃদয়হীনভাবে সেই সমস্ত সঙ্গতির অপচয় না করে, যে সঙ্গতি কোটি কোটি হতভাগ্যকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। আমাদের অনেকেই এখনও এই ধারণা খুব ভালোবেসেই পোষণ করি যে আমাদের এই গ্রহটা আসলে এই যে এত দীর্ঘ সময় ধরে এখানে প্রাণীজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে তা সম্ভবত একটা বিরল ঘটনা এবং এখনও বেশ কিছুদিন আমরা টিকে যাব যদি আমরা এখানে যা রয়েছে সেগুলোকে উড়নচণ্ডীর মতো সব উড়িয়ে পুড়িয়ে না দিই। ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম-মঞ্চের সঙ্গে যারা আবশ্যিক ভাবে জড়িয়ে নেই, তাদের কাছেও 'আরেকটা দুনিয়াও সম্ভব' হয়ত একটা বিশ্বাসযোগ্য বয়ানের মতো মনে হতেও পারে।

এরকম নানা অনুভূতি এবং কিছু অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আমাদের কয়েকজন এক রবিবার বিকেলে জড়ো হয়েছিলাম উন্নয়ন নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলা ও বিকল্পের কিছু খোঁজপত্তর নেওয়ার জন্য। বেশ কয়েকবছর ধরে এরকম সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে এমন একটি বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উদ্যোগেই ওই আড্ডা। যাদবপুরের পূর্বতন একটা উদ্বাস্তু কলোনির এক অনামা প্রাইমারি স্কুলের মেঝেতে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কথা বলছিলাম। স্কুলটার গলির মুখে একটা সুবিশাল বহুতল হাউসিং কমপ্লেক্স, যার নির্মাতা এখনকার এক নামজাদা রিয়াল এস্টেট কোম্পানি।

আলোচনার শুরুতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনটির সম্পাদক তাঁর ভাষণে সকলকে সতর্ক করে দেন যে কেউ যেন এই সংলাপ থেকে খুব বেশি কিছু পাবেন বলে আশা না করেন। কেউই সম্ভবত দাবি করতে পারে না যে পরিষ্কার কাটাছাঁটা বিকল্প কর্মসূচি আমাদের ভালোমতো জানা আছে। কোন প্রেক্ষিতে দেখব বা সমগ্র দৃষ্টি কেমন হবে সেটাই সভার বিষয় হতে পারে। এরকম একটা মনোভাব দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে ও সুযোগ বুঝে আমার সাম্প্রতিক একটা বাতিককে আলোচনায় পেড়ে ফেললাম, যে বাতিকের ঠেলায় আমার ধারণা এতদিনে আমার বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠজনদের আমি যথেষ্ট উত্যক্ত করতে সফল হয়েছি। এটা হচ্ছে আমার

সাইকেলের প্রস্তাব। এখন সিঙ্গুর কারখানায় সস্তার ছোটো যাত্রীগাড়ি বানানোর টাটার প্রকল্পকে কোনও রকম বিরোধিতা করাই এখানে শিল্পায়ন বিরোধিতা বলে সাধারণত দেগে দেওয়া হচ্ছে। আমি বলি তা কেন, সরকার যেমন যেমন দিতে পারে তেমন তেমন জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা টাটাকে দেওয়া হোক, কিন্তু তারা ভালো গুণমানের এবং পারলে আরেকটু যান্ত্রিক সুবিধা বেশি পাওয়া যায় এমন সাইকেল বানানোর কারখানা তৈরি করুক। আমার আরও প্রস্তাব, একই সঙ্গে আমাদের পরিবহণ বিভাগ রাস্তার দুই দিকে আসা ও যাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা দুটো সরু গলির মতো অংশ শুধু সাইকেলের জন্য আলাদা করে তৈরি করুক, যাতে সাইকেল আরোহীরা দুর্ঘটনার বিপদ এড়িয়ে যাতায়াত করতে পারে। মানুষ তার সাধ্যমতো একটা দূরত্ব সাইকেল চালাবে। আরও দূরে যাওয়ার জন্য বা বিশেষ দরকারে যাওয়ার জন্য গাড়ি এবং ট্যাক্সিও থাকবে। তাছাড়া টাটার সাইকেল তো শুধু কলকাতার জন্যই তৈরি হবে না। এটা শিল্পায়ন বিরোধী নয় এবং যাদের ক্রয়ক্ষমতা কম তারাও সাইকেল কিনতে পারবে। এছাড়াও সাইকেল চালাতে জীবাশ্ম জ্বালানি (তেল, কয়লা, গ্যাস) খরচ হয় না এবং এর ফলে পরিবেশের ক্ষতিও কম হবে।

এখান থেকে এর সঙ্গেই সম্পর্কিত সংগঠনের প্রশ্নে আমি চলে যাই। যখনই মানুষ বিকল্পের কথা বলে, তখনই যে পরিবর্তনগুলো আনার ব্যাপারে আমরা একমত হচ্ছি সেগুলো ঘটানোর জন্য একটা উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামোর প্রশ্নে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার একটা ঝোঁক সেই মানুষের মনে তৈরি হয়, যাতে কিনা আমরা একটা বিকল্পের ছবি পেয়ে যেতে পারি। সংগঠনের জন্য এত ত্বরা কীসের তা বোঝা যায়, কিন্তু একটু নরমভাবে একটা প্রস্তাব দিতে চাই যে এই প্রশ্নটা কিছু সময়ের জন্য তোলা থাক। এবার আমার আস্তিন থেকে তাসগুলো টেবিলে ফেলা যাক। বর্তমানে প্রধান ধারার উন্নয়নের প্রত্যয় একইসঙ্গে পুঁজিবাদী এবং রাষ্ট্রিক। রাষ্ট্রিক প্রত্যয়কে এখানে আপাতভাবে অসম্ভব মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিপুঁজিই কি শাসনের ছড়ি ঘোরাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু যে সাংগঠনিক বাতাবরণের মধ্য দিয়ে তা বহুল পরিমাণে ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাজ করছে, তা রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোই তৈরি করে দিয়েছে। প্রকাশ্য দমনপীড়ন রাষ্ট্রই চালায়, রাষ্ট্রই গোপনে পুঁজির আধিপত্যকে আইনসিদ্ধ করে। পবিত্রকরণ করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্তরেই। এবং বিরাট ব্যাপক অর্থে ছদ্ম পবিত্রতা ঢেকে রাখছে জালের মতো ছড়ানো সমগ্র সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে যা কিনা আজকের আধুনিক রাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের কার্যনীতি, মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যমগুলোর অবস্থান ও কার্যকলাপ, কোন বিষয়ে জোর দেওয়া হবে এবং কোন বিষয় বাদ দেওয়া হবে সেইসব মত সম্বলিত সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার ধাঁচা, পরিব্যাপ্ত প্রভাবে ভেসে যাওয়া পারিবারিক মূল্যবোধ এবং প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতার ধারণার মতবাদ।

এখানে আমি দেখাতে চাই যে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে আমাদের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট চর্চার আগেই দ্রুত সংগঠন গড়ে তোলায় জোর ফেললে প্রায়শই তা নিঃসাড়ে এমন এক প্রস্তাবনা হিসেবে গড়ে ওঠে যে তার পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখল করার একটা কার্যকরী প্রকল্প মাত্র। আমাদের এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের সর্বক্ষেত্রকে ছেয়ে ফেলার জন্য যখন রাজনৈতিক সমাজ তার শিকড় আরও গভীরে চারিয়ে দিচ্ছে, তখন এই বিষয়ে সতর্ক থাকা আরও বিশেষভাবে জরুরি। রাজনৈতিক সমাজের আওতার বাইরে, জনসমাজের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান চালানো এই কারণেই আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। বর্তমান অবস্থায় বিশ্বপুঁজি তার অবক্ষয়কে যেভাবে চারিদিকে প্রসারিত করছে, তাকে আটকানোর জন্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই যথেষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে। একমেরু বিশ্ব বলতে যা বোঝায়, প্রায় সেই অর্থে এই পুঁজি রাষ্ট্রক্ষমতাকে যথেষ্ট পরিমাণে দখল করে ফেলেছে। রাজনৈতিক সমাজের স্তরে এটা বড়ো আকারের সত্য এবং তার জন্যই প্রয়োজন এর বাইরে গিয়ে তাকানো।

নীরব প্রত্যয়গুলোকে প্রশ্ন করা বরাবরই কঠিন। আবার সেই কারণেই এই প্রশ্ন করার গুরুত্ব বাড়ে। বিকল্পের সন্ধানে আমাদের অবশ্যই বিকল্প প্রত্যয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিকল্পের ধারণাটাকেই একবার পরখ করা দরকার। ধরা যাক আমরা একটা কাগজের টুকরোয় একটা দাগ দিলাম। এই দাগটাকে ঘিরে একটা বৃত্ত আঁকা হল। এবার ওই বৃত্তের মধ্যেই দ্বিতীয় একটা দাগ দিলাম। এটা প্রথম দাগের বিকল্প। এবারে বৃত্তের বাইরে আরেকটা দাগ দিলাম। এটাও প্রথম দাগটার বিকল্প। কিন্তু সীমার বিচারে এই দুটো বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে। আরও আরও বড়ো বৃত্ত এঁকে বিকল্পের সীমাকে অসীম পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। অতএব বর্তমানে আমাদের যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু রয়েছে তার বিকল্প ভাবতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে মনে ঠিক করে নিতে হবে যে, কোন সীমা পর্যন্ত আমরা আমাদের অনুসন্ধান চালাব। এরকম একটা চিন্তার কাঠামো গড়ে নিয়ে এবারে আমরা প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারি। আমাদের চালু চিন্তার জগতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে একটা গুণ এবং দক্ষতা এমন একটা জিনিস যা অর্জন করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি ভালো করে ভেবে দেখে, তাহলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই গুণগুলোর ভিত্তিতে বা মূলে রয়েছে এক ধরনের পরিমাণগত চিন্তা, যার আবার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। অতএব এইসব গুণের বাঁধন থেকে নিজেদের ছিন্ন করতে হলে আমাদের পরিমাণগত ভাবনার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

বর্তমানে উন্নয়নের নামে যা চলছে তা মূলত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। এটা হচ্ছে উৎপাদনের বিস্তার — আরও আরও উৎপাদন। ভোগ্যবস্তু ও পরিষেবার প্রচুর উৎপাদন। উচ্চহারে বৃদ্ধি শুধু এটাকেই চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন অব্যাহতভাবে চলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কী উৎপাদন হচ্ছে তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। এটাই হল সবসময় প্রসারিত হচ্ছে এমন এক অর্থনীতির ছবি। এইসবই কিন্তু শুধুমাত্র পরিমাণগত এবং সেই পরিমাণেই পণ্যরতিময়। আসলে অর্থনীতির প্রসারণ চাওয়া হয়েছিল, কারণ মনে করা হয়েছিল যে এর সঙ্গে আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার একটা সম্পর্ক রয়েছে। ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজনের ভোগ্যবস্তু ও পরিষেবার প্রয়োজন হয়। এটাই ছিল মৌলিক সংযোগ। একবার সেই সংযোগের সুতো ছিঁড়ে গেলে অর্থনীতির প্রসারণ ভালোভাবে বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করতে পারে না, অন্তত বহুজনের জন্য পারে না তো বটেই। শুধু লাভের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা পুঁজিবাদী সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় প্রয়োজন ও ব্যবহারযোগ্যতার পরিবর্তে ক্রয়ক্ষমতা ও বিক্রয়যোগ্যতাই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কীভাবে আপনি বেঁচে আছেন, তা একটা গুণগত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আপনার কতটা কী আছে তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। কোন এক ঐতিহাসিক স্তরে কার কী আছে তার সঙ্গেই তার বেঁচে থাকা সংযুক্ত ছিল। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পুঁজিবাদী সাংগঠনিক কাঠামোর এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রার একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে।

এইরকম অনেক বিযুক্তির অবশ্যই একটা দীর্ঘ বয়ান আছে। বিযুক্তির প্রক্রিয়াটা ক্রমশ ভরবেগপ্রাপ্ত হয় যতই তীব্র পণ্যরতির মধ্য দিয়ে তা নিজেকে পুনরুৎপাদিত করে চলে। বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে রাষ্ট্রীয় পরিসরে জোর পড়ে গেলে গোটা বিষয়ের এই দিকের প্রতি দৃষ্টি হারিয়ে যেতে পারে। প্রস্তাবনার বিষয়গুলোকে উল্টেপাল্টে

সাজালে হয়তো তা একটা বিষয়ীবাদের সমালোচনার মুখে পড়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পরিমাণের বদলে গুণের ওপর জোর দেওয়ার এই যে প্রস্তাব তা বিষয়ীবাদের অভিমুখেই ঠেলে নিয়ে যায়। এটাকে বহুদিন ধরে অবহেলা করা হয়েছে। এরকম সন্দেহ করার কারণ আছে যে বিযুক্তি ও পণ্যরতির প্রক্রিয়াগুলোই এই অবহেলার বড়ো হেতু।

প্রয়োজনগুলো, প্রকৃত প্রয়োজনগুলোকে তাদের সঠিক আসনে বসানো দরকার। সঙ্গতি ও সংস্থানগুলো মূল্যবান। ছোটো ছোটো কারণে সেগুলোকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কে ঠিক করবে কোন প্রয়োজনগুলো খাঁটি এবং কেমন করে তা ঠিক করা যাবে? প্রথম প্রশ্নের গণতান্ত্রিক উত্তর হল, সর্বসাধারণের হাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় প্রশ্নটা কূট প্রশ্ন। প্রয়োজনের সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য কেউ নিশ্চয়ই শুধু জৈবিক সীমাতেই থেমে থাকবে না। সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রয়োজনকেও বিবেচনার মধ্যে আনা স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার সভ্যতার ঐতিহাসিক যাত্রায় কতকগুলো প্রয়োজন অর্জন করেছে এবং সেগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এই সমস্তকে মাথায় রেখেই যিনি চিন্তা করবেন, তাঁকে বিচার করতে হবে কোন প্রয়োজনটা বাজারের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কোনটা ফ্যাশনের দ্বারা উদ্দীপিত, কোনটা সরকারের নীতিতে উৎসাহিত আর কোন প্রয়োজনটা সরাসরি মিডিয়া-প্রসূত। এর যে কোনটাকেই গ্রহণ করা দোষের নয়। তবে বিনা সমালোচনায় এগুলোর কাছে নত হয়ে না পড়ার ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য এর বাইরেও ধূসরভূমি থেকে যেতে পারে।

উন্নয়নের নামে এখন যা চলছে, তা শুধু পরিমাণগত বৃদ্ধিকেই মূল্য দেয়। এটা অপচয়ী ও হিংস্র হয়ে ওঠে। অপচয়প্রবণতা ও হিংস্রতা হল গুণগত বিষয়। পরিমাণগত উন্নয়ন শুধু প্রসারণ বোঝে। কোন একটা বিশেষ উৎসের ব্যবহারে হয়তো দেখা গেল কিছু অদরকারি প্রয়োজন মিটছে বা তা কতকগুলো হিংস্র সামাজিক অভ্যাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে — এগুলোর জন্য ওই প্রসারণকে থামানো চলে না। হিংস্রতা মানে শুধু খোলাখুলি পুলিশ বা মিলিটারি প্রয়োগ নয়। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে, পারিবারিক সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে আমাদের চারপাশের সমাজে হিংস্রতা ও আগ্রাসনের মনোভাব এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে যে জীবনের দেওয়া-নেওয়া কঠিন ও বেদনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জীবন আর যেরকমই হোক না কেন, বেঁচে থাকার সার্থকতা যেন তাতে থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং উন্নয়নের প্রকল্পগুলো এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যার সঙ্গে জীবন সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের এখনকার উন্নয়নের যে চল তা সমাজজীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ এবং গোষ্ঠীসংঘর্ষ ও উত্তেজনার এই ব্যাপকতার কারণকে ব্যাখ্যা করার জন্য শুধুমাত্র ওগুলোকে অপবাদ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। অভূতপূর্ব বিশ্বজোড়া খাদ্যসংকটে পৃথিবী যে এখন ডুবতে বসেছে, তার সঙ্গে যে তথাকথিত মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্পর্ক রয়েছে, সেই যুক্তি ইতিমধ্যেই সামনে উঠে এসেছে। পরিমাণগত চিন্তাকাঠামোর যে প্রকল্প, তার মধ্যেই নিহিত আছে মুক্ত বাণিজ্যের যুক্তি এবং তার সাংগঠনিক বিন্যাস যার নাম বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা বা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন'। এর সঙ্গে বাজার-প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য যুক্ত হয়ে সম্পদ ও সঙ্গতিগুলোর ব্যবহারের এমন এক ছক গড়ে তোলে যাকে প্রয়োজনভিত্তিক নীতি থেকে বিচ্যুত বলে মনে হয়। যে সমাজ তার একটা অংশের মুখের অন্ন জোগাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েও নয় শতাংশ বৃদ্ধির হার নিয়ে বুক চাপড়িয়ে গর্ব করে, তাকে সকলের বিবেকবান বলে না-ই মনে হতে পারে। কিন্তু পরিমাণগত বৃদ্ধি কেন্দ্রিক ধারণার অন্য কোন পালানোর রাস্তাও নেই। এখানে ওখানে আর্থিক ও রাজস্বনীতির ঝালাই দিয়ে বড়ো জোর মুদ্রাস্ফীতিকে খানিক ঠেকানো যায়। কিন্তু স্পষ্টতই তা প্রয়োজন ও সঙ্গতির সামঞ্জস্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট নয়। এইজন্য প্রয়োজন আমাদের চিন্তাভাবনার ছকটাকেই বদলে ফেলার। আশা করি একথাটা ঠিক আকাশকুসুম কল্পনার মতো হাস্যকর কিছু নয়।

হালফিল কাশ্মীর আন্দোলন

আফসানা রশিদ

শ্রীনগর থেকে সাংবাদিক আফসানা রশিদ এই লেখাটি পাঠিয়েছেন ১১ আগস্ট ২০১০। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।

গত দু'মাস যাবৎ উপত্যকা জুড়ে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ত্বরান্বিত হয়েছে। এধরনের ঘটনা অতীতেও ঘটেছে। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকত গুটিকয়েক মহল্লায়। সম্প্রতি তা কেবল আকারে ও সংখ্যায় বেড়ে ওঠেনি, কাশ্মীরের রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্র দখল করে নিয়েছে এই বিক্ষোভ আন্দোলন। ১১ জুন থেকে গত ৬১ দিনে ৫২ জনের জীবনহানি হয়েছে।

গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছিল ১১ জুন। ওইদিন সাইদা কাদাল এলাকার বাসিন্দা তুফেল আহমেদ শ্রীনগরের রাজৌরি কাদালে টিয়ারগ্যাসের শেল ফেটে মারা যান। এর থেকে শুরু হয় জনতার পাথর ছোঁড়া এবং নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ; ঘটনাক্রমে যোগ হয় আরও প্রতিবাদ, আরও মৃত্যু।

এক-একটা মৃত্যুর ঘটনা উসকে দেয় আরও প্রতিবাদকে; ক্রমে বাড়তে থাকে পাথর ছোঁড়া যুবকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে; এক দশকেরও বেশি সময় পরে ৭ জুলাই সেনাবাহিনী শ্রীনগর শহরের কয়েকটি এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করে। স্থানীয় প্রশাসনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করতে সেনাবাহিনীর ১৭ কলাম (প্রায় ১৭০০) ফৌজকে শহরের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়।

"আমরা বন্দুক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে; বন্দুকের তো কোন প্রয়োজন নেই, সত্যি বলতে কি আমরা পাথর ছুঁড়তেও চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতেই চাই। কিন্তু পুলিশ আর নিরাপত্তা রক্ষীরা লাঠিচার্জ করে, আমাদের বাড়ির জানলার শার্সি ভেঙে দিয়ে, আমাদের সাথীদের উত্তক্ত করে আমাদের পাথর ছুঁড়তে প্ররোচিত করে" — এই কথাগুলি বলেছে শ্রীনগর, অনন্তনাগ আর পাটানের বহু প্রতিবাদকারী। তাদের মতে, প্রশ্নটা ভালো বা মন্দ প্রশাসনের নয়। "লোকে এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে; এমনকী একটা আট বছরের বাচ্চাকেও রেয়াৎ করা হচ্ছে না"। প্রতিবাদকারীরা মনে করে, পুলিশ নিজেদের সামলে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। "যখন তারা ঘায়েল হচ্ছে, পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠছে। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও নিরপরাধ মানুষের হত্যাকে নিন্দা না করে চুপ করে থেকেছেন"।

ওরা আরও বলছে, যারা পাথর ছুঁড়ছে, "তারা অবহেলিত অভাবী নয়; তারা ভালো পরিবারের সন্তান, শিক্ষিত। তারা চাইছে অধিকার, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারে; তাদের যাতে কেউ পাথর ছোঁড়া যুবক বলতে না পারে"। রাউফ আহমেদ নামে এক

বিশিষ্ট আইনজীবী পাথর ছোঁড়াকে 'বিদ্রোহের প্রকাশ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, "এটা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। সবসময় পুলিশ আর নিরাপত্তা বাহিনীকে পথেঘাটে দেখতে দেখতে ওরা আসলে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ওদের তো বন্দুক নেই, তাই পাথর ছুঁড়ছে। আদতে কেউই এখানে সেনাবাহিনীকে পথেঘাটে দেখতে চায় না"।

দক্ষিণ কাশ্মীরের দুরু-তে একদল যুবতী বলেন, "ওরা যদি বলে এটা একটা নির্বাচিত সরকার আর সেই সরকারের বিরুদ্ধেই লোকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তাহলে জনসাধারণের মনোভাবকে সকলের সামনে প্রকাশ করাই তো সেই নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। কিন্তু কোন সরকারই এখানে সেই দায়িত্ব পালন করেনি।" এই যুবতীদের মতে পাথর ছোঁড়া প্রতিবাদের সঠিক পদ্ধতি নয়, 'অন্য পন্থার কথা ভাবা উচিত'।

প্রসঙ্গত, 'ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিল' (UJC) প্রধান সৈয়দ সালাহ-উদ-দীন অনির্দিষ্টকালীন হরতাল তুলে নিতে বললে ২৪ জুলাই 'স্টোন পেল্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' (SPA) তা প্রত্যাখ্যান করে এবং জানায়, হরতাল চলবে। পুরনো শহরে মিডিয়ার কাছে একদল মুখোশধারী যুবক বলে, UJC প্রধানের বিবৃতি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা বলে, "আমরা সৈয়দ সালাহ-উদ-দীনকে শ্রদ্ধা করি বটে, কিন্তু তিনি এখানকার বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন"। উপত্যকার কোন কোন জায়গায় UJC প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশন জানায়, তাদের ভায়েদের হত্যা করা হচ্ছে, "আমাদের কাছে নিরাপত্তা রক্ষীদের মোকাবিলা করার জন্য কোন বন্দুক নেই, আছে কেবল পাথর ছোঁড়ার উপায়। আমরা পাথর ছোঁড়া চালিয়ে যাব"। ওরা জনসাধারণের কাছে হরতাল পালন করার আবেদন জানিয়েছে আর এটাও বলেছে, এই আবেদন লঙ্ঘন করলে কী হবে, সে ব্যাপারে তারা কোন দায়িত্ব নেবে না।

২৩ জুলাই UJC প্রধান সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন করেন এবং তাদের হরতাল বাদ দিয়ে এমন কোন স্ট্র্যাটেজি নিতে বলেন, যাতে জনসাধারণ অসুবিধায় না পড়ে এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ব্যাহত না হয়। এখানে এক টেলিফোন-সাক্ষাৎকারে তিনি স্থানীয় সংবাদ সংস্থাগুলিকে জানান, "লাগাতার হরতাল কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান নয়"। পাথর ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে যুবক ও নিরাপত্তা রক্ষীদের আঘাত-প্রত্যাঘাত শুরু হয়। কেউ বলে, যুবকেরাই সংঘর্ষ শুরু করেছে; আবার অন্যরা বলে, নিরাপত্তা রক্ষীরা শুরু করেছে। কয়েক জায়গায় রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। মুখোশধারী যুবকেরা রাস্তার ওপরে উঠে আসছিল, ফলে নিরাপত্তা রক্ষীরা সতর্ক হয়ে উঠল। শীঘ্রই আরও অনেক যুবক এতে যোগ দিল। এবার শুরু হল দু'পক্ষের এক সুপরিকল্পিত লড়াই। পাথর ছোঁড়া, তাড়া করা, লাঠিচার্জ আর টিয়ার গ্যাসের শেল ছোঁড়া — একসঙ্গে চলতে থাকল। পরিণামে যুবকদের জীবনহানি যা হিংসাকে উসকে দিল।

কিছু লোক এই চলমান হিংসাকে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফল হিসেবে দেখছে; কেউ একে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে দেখছে; আবার কেউ বলছে, এটা এক রাজনৈতিক ছলাকলা।

শ্রীনগরের একদল ছাত্র বলে, "হত্যা পাথর ছোঁড়াকে প্ররোচিত করছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর পদক্ষেপ না নিয়ে, হত্যার তদন্ত না করে মুখ্যমন্ত্রী নিরস্ত্র জনসাধারণকে দমন করতে আরও বেশি ফৌজ নিয়ে আসার কথা বলছেন। এতে একটাই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছাচ্ছে যে সব কিছু ঠিকঠাক নেই এবং সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর ব্যবধান রয়েছে।" তারা এটাও বলেছে, তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানোর এটাই ছিল সরকারের কাছে উপযুক্ত সময়। হত্যা বন্ধ করে সরকার গত দু'মাসের ওপর ঘটা সমস্ত মৃত্যুর তদন্ত করতে পারত; বিশেষত বাটামালুর বাসিন্দা আট বছরের বাচ্চা সামীর আহমেদ রাহ-কে যেভাবে পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীরা নির্মমভাবে পিটিয়ে মেরেছিল, তার তদন্ত করতে পারত।

উপত্যকা জুড়ে মানুষ কার্ফু অগ্রাহ্য করে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। পুলিশ স্টেশন, পুলিশ পোস্ট ও ক্যাম্প সহ বহু সরকারি ভবন তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। রেলস্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া এবং সোপোর ও বাদগাম সহ কিছু শহরে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ৪ আগস্ট রেল অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রতিবাদকারীরা গাছ কেটে আড়াআড়ি ফেলে রেখে ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করে।

রাতের বিক্ষোভে উপত্যকা আলোড়িত হয়ে ওঠে। স্থানীয় মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা হয়, জনসাধারণ নিজ নিজ এলাকায় সমবেত হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিবাদ করুক। মহিলা ও বাচ্চারাও তাতে শামিল হয়। এইসব দৃশ্য উপত্যকার ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু একটা তফাত রয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে গুলিচালনা, গ্রেনেড ছোঁড়া আর তল্লাশির জায়গা নিয়েছে এবার পাথর। লোকে তখন কার্ফু অগ্রাহ্য করার কথা ভাবতে পারত না, এখন সেটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদকারীদের হালকা পানীয়, ভুট্টার খই, জল, খেওয়া (কাশ্মীরি মিষ্টি চা) আর তেহরি (হলুদ ভাত) দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। এসব ব্যবস্থা নিজে থেকেই করছে মহল্লা কমিটি বা স্থানীয় পরিবার যাদের ঘর প্রতিবাদ-স্থলের কাছে; কিংবা যে পথ দিয়ে প্রতিবাদকারীরা যাচ্ছে সেই পথের মাঝে যাদের ঘর তারাই এসবের বন্দোবস্ত করে। যারা অভাবে পড়েছে, তাদের জন্য স্থানীয় মানুষ কিছু ত্রাণের বন্দোবস্ত করছে। লোকে রেশনের ডিপোতে ভিড় করছে; যখন রেশন দেওয়া হচ্ছে কিছুটা ধাক্কাধাক্কিও কোথাও কোথাও নজরে পড়ছে।

শ্রীনগরের সীমানায় বাস করেন বছর চল্লিশের মহিলা মাইমুনা আখতার (নামটা পাল্টে দেওয়া হল)। তিনি তাঁর ছেলেকে পাথর ছোঁড়া বন্ধ করাতে পারছেন না, বললেন, "অনেক চেষ্টা করেছি, আমি আমার ১২ বছরের ছেলেকে পড়ায় মন দিতে আর পাথর ছোঁড়া বন্ধ করতে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না"।

ওঁর স্বামী, এক আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি, যা আয় করেন তাতে পরিবারের পাঁচ সদস্য নিয়ে চলে না। মাইমুনা বলেন, "ঘরের অবস্থা দেখে আমার ছেলে পাথর ছোঁড়ার দলে ভিড়েছে, ভাবছে এতে আমাদের দুর্দশার অবসান হবে। আমরা পুনর্বাসন চাই। কিন্তু এখনও তার কিছুই হয়নি। ফলে আমাদের বাচ্চারা বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে"। কয়েক কিমি দূরে তিন সন্তানের মা শাহজাদা বানু ছেলেমেয়েদের ঘরের বাইরে বার করতে ভয় পান। তিনি বলেন, "সামীরের মৃত্যু আমাদের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। কীভাবে একটা ছোট্ট বাচ্চা নিরাপত্তার বিপদ হতে পারে? ওরা আমাদের শান্ত হওয়ার কথা বলছে, কিন্তু এধরনের ঘটনা মানুষকে হিংসার পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা মোটেই নিরাপদ নয়"।

কারও মতে, পরিস্থিতি অভিবাসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। "বহু পরিবার পরিস্থিতির চাপে দেশের অন্যত্র চলে যাচ্ছে। বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও পরিবার রাজ্যের বাইরে কারবার সরিয়ে নিচ্ছে"। তাদের বক্তব্য, লেখাপড়াও দারুণ মার খাচ্ছে। "অনেকের কর্মজীবন বিপন্ন এবং বহু ছাত্র উপত্যকার বাইরে কোন কোর্স করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সকলের তো সেই সঙ্গতি নেই"। সমাজের একটা অংশ মনে করে, বহু মানুষের জীবিকা, বিশেষত যারা ট্যুরিজম ও হর্টিকালচারের সঙ্গে যুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

"কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে এখানে বেকারত্ব বেড়েছে এবং তা যুবকদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দিতে বাধ্য। বহু বেসরকারি কোম্পানি তাদের কর্মীদের অন্যত্র চলে যেতে কিংবা পদত্যাগ করতে বলছে"।

যখন থেকে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে, কাশ্মীর উপত্যকায় প্রতিদিন ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (KCCI)–র প্রেসিডেন্ট নাজির আহমেদ দার বলেন, "হর্টিকালচারের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হচ্ছে। ... ভারত সরকারকে এখনই এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করা দরকার।" কাশ্মীরের সমস্যাটা রাজনৈতিক এবং তার সমাধান দরকার, একথা বলেন নাজির আহমেদ দার। তিনি যোগ করেন, "প্রতি বছর ট্যুরিজমের মরসুমের চড়া অবস্থায় এধরনের ঘটনা ঘটে। গত ৬৩ বছর ধরে আমরা ভুগছি, বিশেষত গত দুই দশকে। ব্যবসা–বাণিজ্য দারুণ মার খেয়েছে।"

এই সময়, মাঝে এখানে সেখানে সামান্য বিরতি ছাড়া, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকছে, বাজার শুনশান এবং রাস্তায় যানবাহন নেই। হুরিয়ত কনফারেন্সের কট্টর গোষ্ঠীর নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি সাপ্তাহিক বনধ আর প্রতিবাদের ক্যালেন্ডার তৈরি করে দিয়ে জনসাধারণকে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করতে বলেন। মাঝে তাঁরা কিছু বিরতি দেন, যাতে লোকে জরুরি জিনিসপত্র মজুত করে নিতে পারে।

একের পর এক বিচ্ছিন্নতাকামীদের বন্‌ধ, নিষেধাজ্ঞা এবং সরকারের কার্ফু ঘোষণা উপত্যকাকে অশান্ত করে তুলেছিল; জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এর মধ্যেই সবজি ও অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা মারাত্মক অসুখবিসুখে ভুগছে, তাদের এখনই চিকিৎসার প্রয়োজন। রাস্তায় ডাঁই করা জঞ্জাল ছড়িয়ে রয়েছে, তা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বেড়াতে আসার চরম মরসুমে পর্যটকদের সংখ্যা প্রায় শূন্য। পরিবহনের অভাবে ফলচাষি ও ব্যবসায়ীরা বাজারে মাল নিয়ে আসতে পাছে না, ফলে তাদেরও লোকসান হচ্ছে।

ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে, পাথর ছোঁড়া এবং ফেসবুক ও অর্কুট সহ ইন্টারনেটে প্ররোচনামূলক বার্তা পাঠানোর জন্য বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুপরিচিত আইনজীবী ইজাজ আহমেদ বলেন, "পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় প্রায় ১৫০০–২০০০ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকে জামিন ছাড়া পেয়েছে। এমনকী, জামিনের নির্দেশ কার্যকর না করে অনেককে ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ধরনের জুলুমের কারণে কিছু যুবক উপত্যকা ছেড়ে চলে গেছে।"

যাই হোক, ২৯ জুলাই পুলিশ জানায়, তাদের হেফাজতে ৭১ জন আটক রয়েছে। পুলিশের এক মুখপাত্র জানায়, ১ মে থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন পাথর ছোঁড়া ও শান্তি বিঘ্নিত করার ঘটনায় পুলিশ ৯৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের অভিভাবক ও মহল্লার প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে ৮৫১ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ৭১ জন আটক রয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, "ওই সময়ে উপত্যকায় মোট ৩৩০টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে, তাতে ৭৯৫ জন পুলিশ ঘায়েল হয়েছে, নাগরিকদের মধ্যে ঘায়েল হয়েছে মাত্র ৭৮ জন। এছাড়া, সিআরপিএফ–এর ১৩৬ জন ঘায়েল হয়েছে।"

কাশ্মীরে গণতন্ত্র হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে

হানিফ মহম্মদ

শ্রীনগর থেকে হানিফ মহম্মদ এই লেখাটি পাঠিয়েছেন ১৩ আগস্ট ২০১০। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।

কাশ্মীর এক অজানা পথে এগিয়ে চলেছে। প্রতিবাদ, সংঘর্ষ, হিংসা, হত্যা আর ক্রোধ প্রতি বছর এক অভাবনীয় রূপ ধারণ করছে।

এবছর দেখা গেল আর এক নিরবচ্ছিন্ন হিংসার স্রোত; ফলস্বরূপ পঞ্চাশের বেশি মানুষের মৃত্যু হল, হাজার হাজার মানুষ আহত হল; নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েন করা কার্ফু এবং হত্যার প্রতিবাদে ও রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাকামীদের ডাকা হরতালে পথঘাট জনমানবহীন হয়ে রইল। যখন সাম্প্রতিক ভারত বন্‌ধের দিন দিল্লিতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করল, একই দিনে কাশ্মীরে পুলিশ আর সিআরপিএফ ব্যবহার করল বুলেট।

বিশ বছরের ওপর এখানে কৃত্রিমভাবে বাহ্যিক একটা শান্তির আবরণ তৈরি করা হয়েছে; তার জন্য আধুনিক উপায়ে 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' (AFSPA)–কে ব্যবহার করা হয়েছে; এত নিবিড়ভাবে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রয়েছে যে কাশ্মীরকে বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ মিলিটারাইজড জোন বলা যেতে পারে; প্রতি পাঁচবছর অন্তর এখানে জনগণের অংশগ্রহণ–বিহীন একটা ভুয়া নির্বাচন হয়; কেন্দ্রীয় খাতে যে হাজার হাজার কোটি ভারতীয় টাকা আসে, তা হয় দুর্নীতি, না হয় গুপ্তচরবৃত্তি, সামরিক কার্যকলাপ, এজেন্সি ফান্ডিং বা কাগুজে উন্নয়নের নামে ব্যয় হয়। বছরের পর বছর এটাই চলে আসছে। প্রতিবার যখন প্রতিবাদ, হত্যা আর দমনের চক্রটা ফিরে আসে, আরও বেশি বেশি ফৌজ মোতায়েন হয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যার গতিপ্রকৃতিকে আরও জটিল করে তোলে, ফলে আইন–শৃঙ্খলার আরও অবনতি ঘটে, জনসাধারণ তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া থেকে আরও দূরে সরে যায়। পরপর তিনবছর গণ্ডগোল চলছে, যেখানে গণ্ডগোলের কারণ এবং ফলাফল একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে। কাশ্মীর ক্রমশ যেন এক দিগভ্রান্ত নৌকার মতো এই ডামাডোলের মধ্যে কুলের সন্ধান করে চলেছে।

ক্ষমতাহীন রাজ্য সরকার

রাজ্য সরকার প্রথমে এই বিক্ষোভকে একটা মামুলি ঘটনা হিসেবে দেখাতে চাইল। কিন্তু যখন মাত্রাতিরিক্ত দমনে উপত্যকা অশান্ত হয়ে উঠল এবং তার জবাবে হত্যার ঘটনা ঘটল, মুখ্যমন্ত্রী টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে বললেন, স্বাভাবিক ক্রোধের বিষয় রয়েছে। তারপর হত্যা আরও বাড়ল। তিনি নয়া দিল্লিকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাদের সিআরপিএফ–কে সংযত করতে বললেন। উল্টে নয়া দিল্লি তাঁকে ডেকে পাঠাল এবং তাঁকেই সংযত হতে বলল। দিল্লি থেকে ফিরে তাঁর ভাষা বদলে গেল, তিনি নয়া দিল্লির কর্তাদের সুরে কথা বলতে লাগলেন। তাহলে প্রশ্ন আসে, মুখ্যমন্ত্রী কি অন্য কিছুর চেয়ে নিজের কুর্সিটাকেই বেশি ভালোবাসেন? নাকি তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা জানেন? অথবা AFSPA হয়ত তাঁকে ক্ষমতাহীনে পরিণত করেছে? হয়ত গত বিশ বছরে AFSPA–র মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনীতে এক নতুন সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে?

উর্দিধারীরা কীভাবে চলে

নির্বিচার হত্যা চলাকালীন উর্দিধারীরা বলে চলেছে, আত্মরক্ষার তাগিদেই তারা যা কিছু করেছে। যদিও এখন পর্যন্ত একজন পুলিশও পাথর ছোঁড়ায়

মারা যায়নি। গত ৫৭ দিনে যে ৫০ জনের বেশি নাগরিক মারা গেছে, তার অধিকাংশই কিশোর, ১০০০ জন আহত হয়েছে এবং কিশোরদের অনেককেই মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। সংবাদসংস্থা 'রয়টার্স' এক বালকের বেদনাদায়ক মৃত্যুকে এই ভাষায় প্রকাশ করেছে : "মারুফা খান পুলিশের গুলিতে তাঁর জ্ঞাতিভাই ১৭ বছরের মহম্মদ ইকবালের মৃত্যুকে বর্ণনা করেন, 'ও বিস্কুট কিনতে বাইরে গিয়েছিল'। এক দোকানদার ইকবালকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। ওর মাথার পিছনে একটা বুলেট ঢুকে গিয়েছিল, চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। ছ'দিন পর ওর মৃত্যু হয়।"

১৩ বছরের বাচ্চা ফয়জানের মৃত্যুর খবর বেরিয়েছিল 'কাশ্মীর টাইম্‌স' পত্রিকায়। ওর মা ফরিদা বলেছিলেন : "আমার ছেলে দুই বন্ধুর সঙ্গে বিকেলে রাস্তায় এমনি হাঁটছিল। আজাদ গুঞ্জ সেতুর ওপর দুদিক থেকে পুলিশ আর সাদা পোশাকের SOG রক্ষীরা এসে ওদের ঘিরে ফেলে। এক স্থানীয় SOG রক্ষী ফয়জানের মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেই রক্ষী তখন ওর গোড়ালি ধরে ওকে টেনে তুলে ঝিলমের জলে ফেলে দেয়, যাতে জলে ডুবে মারা গেছে বলে মনে হয়।" এটা ওর মা এক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জেনেছেন। ফরিদা আরও বলেন, যখন অর্ধমৃত ফয়জান ডুবে যাচ্ছিল, পুলিশ ও SOG রক্ষীরা ওর দিকে গুলি আর কাঁদানে গ্যাস শেল ছোঁড়ে, তাতে ওর মৃত্যু হয়। ফরিদার কথায়, "যখন ফয়জান ডুবে যাচ্ছে, সে হাত তুলে সাহায্য চাইছিল। পুলিশ ও SOG রক্ষীরা তখন ওর দিকে আর ওকে বাঁচাতে আসা লোকেদের দিকে গুলি ও কাঁদানে গ্যাস শেল ছুঁড়তে থাকে। আমি যখন ওখানে পৌঁছালাম, এটা আমিও স্বচক্ষে দেখেছি।"

এরপর আমরা জানলাম ন'বছরের শিশু সামীরের মৃত্যুর ঘটনা। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল : "ন'বছরের বালক সামীর আহমেদ রাহ-কে বাটামালু-তে সিআরপিএফ জওয়ান মারধোর করে। এক প্রত্যক্ষদর্শী নাজির আহমেদ বলেন, 'ওরা ওকে পেটায়, লাথি মারে। ও জ্ঞান হারায়।' শিরদাঁড়ার আঘাতে সামীরের মৃত্যু হয়।"

এই হল নিরাপত্তা বাহিনীর রণকৌশল এবং গতিবিধির সামান্য কয়েকটা নমুনা। পৃথিবীর কোথাও পাথরের জবাবে বুলেট চলে না। আর সেটাও পায়ে নয়, বুকের ওপর দিকে তাক করে! AFSPA নামক আইনের জোরে সশস্ত্র বাহিনী এই শান্তিরক্ষার পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছে।

নয়া দিল্লি ভুল হিসেব করছে

নয়া দিল্লি তার মিডিয়ার সাকরেদদের নিয়ে বাজারে তত্ত্ব ছড়াচ্ছে, প্রতিবাদকারীরা সন্ত্রাসবাদীদের মদত পাচ্ছে, সশস্ত্র রক্ষীদের তারা পাথরের মতো প্রাণনাশী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করছে, সম্ভবত সেই পাথরগুলোও পাকিস্তানে তৈরি হয়েছে। এই আষাঢ়ে গল্প বেচতে না পেরে তারা আর একটা গল্প আমদানি করেছে, যারা পাথর ছুঁড়ছে, তাদের উত্তেজিত করার জন্য আফগানিস্তান থেকে মাদক আসছে। এইসব গল্প ছাপিয়ে উপত্যকার পরিস্থিতি তাদের হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছে।

সংবাদপত্রের বিশিষ্ট লেখক বলরাজ পুরি এই পরিস্থিতিকে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন, "২০১০ সালে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ কিশোরদের কয়েকটি গোষ্ঠী শুরু করেছে। হুরিয়ত কনফারেন্সের কোন গোষ্ঠী এটা চালাচ্ছে না। ১১ জুন ১৭ বছরের যুবক তুফেল আহমেদ মাট্টু-র হত্যার ঘটনায় বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। ওর বাবা-মায়ের কাছ থেকে জানা যায়, ও ক্রিকেট খেলছিল, এমন সময় একটা কাঁদানে গ্যাসের শেল মাথায় এসে লাগে। এরপর চক্রাকারে একটা আবর্ত চলতে থাকে। এক কিশোর বা যুবকের হত্যা প্রতিবাদ বিক্ষোভ উস্কে দেয়, পুলিশ ও সিআরপিএফের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে, ফের আর এক বালকের হত্যা হয়, তাতে আবার কিশোর ও যুবকদের প্রতিবাদ। এইভাবে ২৯ জুন পর্যন্ত ১১ জন বালকের মৃত্যু ঘটে।"

প্রতিটি রাজনৈতিক দল আজ জানে, একটা কারণকে আড়াল করতে গিয়ে আড়াল হয়ে যাচ্ছে তার সমাধান, সেটা একটা ভুল পথে বেশ কয়েক পা এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে নয়া দিল্লির ভুল হিসেবের নিরবচ্ছিন্ন আবর্তে কাশ্মীর আজ বন্দী।

কাশ্মীরের স্থায়ী অসুখটা কী

প্রতিটি হিংসার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে দৌড়ে যান, সেখানে জরুরি সভা হয়। সভায় আরও আগ্নেয়াস্ত্র আর ফৌজের বন্দোবস্ত হয় কাশ্মীরের জন্য; AFSPA আইনের খোলে আরও বুলেট ভরে দেওয়া হয়। হিংসার আবর্ত পুষ্ট হয়। কারণ কাশ্মীরের এই নেতারা আসল অসুখের হদিশ পান না। সরকার অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করে, ন্যায়বিচারের প্যাকেজ অনুপস্থিত থেকে যায়। সাম্প্রতিক বিক্ষোভের বীজ যে এপ্রিলে মাচিল-এর ভুয়া সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রোপণ করা হয়েছিল, এটা ক'জন ভারতীয় সাংসদ বোঝেন? এর বীজ রয়েছে ১০,০০০ নিখোঁজ মানুষের ঘটনায়; এর বীজ রয়েছে ৮০০০ আধা-বিধবার দীর্ঘশ্বাসে; এর বীজ রয়েছে উবে যাওয়া গণতন্ত্র আর বিচারের মধ্যে; এর বীজ রয়েছে ৮০-৯০ লক্ষ নাগরিকের পিছনে ৭ লক্ষ ফৌজ মোতায়েনের মধ্যে; এর বীজ রয়েছে AFSPA—র মাধ্যমে কাশ্মীরকে সন্ত্রস্ত করে রাখার ঘটনায়।

এপ্রিল মাসে মাচিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী তিনজন নিরপরাধ নাগরিককে অপহরণ করে আনে এবং তাদের ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জঙ্গলে নিয়ে এসে হত্যা করে। এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ভুয়া সংঘর্ষ বলে চিত্রিত করা হয়। ক'জন ভারতীয় রাজনীতিবিদ এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে চায়? AFSPA—র তৈরি সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর যে দুর্নীতির ফাঁদে নিরপরাধ গ্রামবাসীদের আটক করে এক সামরিক কারবারের দানব গড়ে তোলা হয়েছে, ক'জন রাজনীতিবিদ তা বোঝেন? সশস্ত্র বাহিনী যদি না মানে, তাহলে বিচার ব্যবস্থার দরকার কী? বিচার ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সামরিক কার্যকলাপের কার্যকারিতা কমিয়ে দেবে, এই ভাবনা অমূলক। তাহলে একশ কোটি ভারতীয়ের জন্য কি কোন কার্যকর বিচার ব্যবস্থা নেই? কোন আইন বিশারদ কি এই দ্বন্দ্বের জবাব দিতে পারেন? যখন মানুষের মর্যাদা আর বেঁচে থাকার অধিকার AFSPA—র মতো এক দানবীয় আইনের দ্বারা লঙ্ঘিত, তখন গণতন্ত্রের মানেটা কী?

গত বিশ বছরে AFSPA জবাবদিহি না করার এক নতুন সংস্কৃতি এখানে তৈরি করেছে। এটা সশস্ত্র রক্ষীরা জানে আর সেই কারণেই নিরস্ত্র জনসাধারণকে গুলি চালিয়ে হত্যা করাটাই তাদের সমষ্টিগত বোঝাপড়া। AFSPA-ই তাদের রক্ষা করে। সেই কারণে শত শত কমিশন আর তদন্তের সরকারি ঘোষণা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কেউ কি আজ পর্যন্ত শাস্তি পেয়েছে? বর্তমান বিক্ষোভ এই অব্যবস্থারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। মিডিয়া একটা গল্প বলছে, সেনাবাহিনী আর একটা, পুলিশ-সিআরপিএফ-বিএসএফ সকলে এক-একটা, রাজ্য সরকার একটা, কেন্দ্রীয় সরকার আর একটা। সত্যটা কোথায়? আমি আমার ভারতীয় ভাইবোনেদের জিজ্ঞাসা করি, তারা কি কাশ্মীর সম্পর্কে সরকারের এই স্থায়ী স্মৃতিবিভ্রমের জবাব চাইবে? মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু কাশ্মীরের জনসাধারণের প্রতি কী অঙ্গীকার করেছিলেন, সচেতন ভারতীয় নাগরিকেরা কি একবার সেটা সরকারের কাছে জানতে চাইবে? যে বীজ এখানে রোপণ করা হয়েছে, তারই ফল তো ফলবে?

এখনই যা করা উচিত

AFSPA—র মতো এক আইনের ঘেরাটোপে যেভাবে কাশ্মীরকে টালমাটাল করে রাখা হয়েছে, যেভাবে ধারাবাহিক প্রতারণার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যেভাবে দুর্নীতির প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে, যেভাবে ভুয়া নির্বাচন এবং সংঘর্ষের ব্যবস্থাকে পোক্ত করা হয়েছে, যেভাবে যুবকদের গুম করে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে আজ কিশোর-যুবকদের ওপর ক্ষমতার নির্বিচার ব্যবহার করা হচ্ছে, আর সেদিন সুদূর নয় যখন AFSPA—র মতো আইনগুলির তৈরি দানবটা ওদের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ছয় দশক ধরে কাশ্মীর ভুগছে, বারবার অনিশ্চয়তার হিংস্র স্রোত তার ওপর আছড়ে পড়ছে। আমি প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের কাছে আবেদন করছি, তারা তাদের নির্বাচিত সরকারের কাছে দাবি করুক : কাশ্মীর থেকে AFSPA প্রত্যাহার করা হোক; কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অংশগ্রহণ করানো হোক; সমস্ত নাগরিক এলাকা থেকে সশস্ত্র বাহিনী সরিয়ে নেওয়া হোক; সমস্ত কাউন্টার ইনসার্জেন্সি গোষ্ঠী ও এজেন্সি বাতিল করা হোক; কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক; গত বিশ বছরে কাশ্মীরে যেসব অপরাধ করা হয়েছে, তার দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা হোক; পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করা হোক।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কোন পথে

জম্মু থেকে প্রকাশিত 'কাশ্মীর টাইম্‌স' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বেদ ভাসিন (সংক্ষেপে বে.ভা.) ২০ আগস্ট কলকাতায় 'শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য পাক-ভারত জনমঞ্চ' আয়োজিত 'প্রণব ঘোষ স্মারক বক্তৃতা' দেন। সেই বক্তৃতাসভায় তিনি কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও সামান্য কিছু বলেন। সেই কথাবার্তার সূত্র ধরে ২১ আগস্ট সকাল ন'টায় আমরা মন্থন সাময়িকীর পক্ষ থেকে তাঁর এক সাক্ষাৎকার নিই। এখানে তা বাংলায় তর্জমা করে ছাপা হল। তর্জমা করেছেন শমীক সরকার।

মন্থন : গতকাল সভায় আপনি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য এক বহুপাক্ষিক সংলাপের কথা বলেছেন। দেখুন, প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ভাষণে সংলাপ এবং মীমাংসার কথা বলেছেন। অথচ কাশ্মীরের ঘটনা অন্য খাতে বইছে। আপনি সংলাপকে কীভাবে দেখছেন?

বে.ভা. : এখন ভারত এবং পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। সেই সময়ে কাশ্মীর নিয়েও আলোচনা হোক। কথোপকথন চালানোর অনেক রকম পদ্ধতি আছে। যেমন ধরুন, ভারত, পাকিস্তান এবং কাশ্মীর — ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। ভারত এবং পাকিস্তান কাশ্মীরের দুটি অংশে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছে। তাই তারাও এই ব্যাপারে একেকটি পক্ষ। তাই তারা এবং জম্মু কাশ্মীরের মানুষ এই আলোচনায় অংশ নিক। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কিন্তু এই নিয়ে আলোচনা অতীতে হয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে তাসখন্দ চুক্তি হয়েছে।[১] তারপর সিমলা চুক্তি হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী এবং জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে।[২] সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সংঘর্ষবিরতি রেখা-ই হবে নিয়ন্ত্রণরেখা (LOC), তাকে বজায় রাখতে হবে এবং কথাবার্তা চলবে। কিন্তু এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে জম্মু কাশ্মীরের মানুষের যন্ত্রণার অবসান হয়নি। তারা এখনও নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।

প্রথমে ভারত সরকার শেখ আবদুল্লাকে জেলে পোরে। তারপর ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার শেখ আবদুল্লার সাথে একটা সমঝোতায় আসে।[৩] তার মধ্যে দিয়ে শেখ আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হন, কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে। আগে তিনি ছিলেন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী। এটাও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাই মূল বিষয় যেহেতু জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ, তাই তাদের এই প্রক্রিয়াতে শামিল করতেই হবে। এবং সেই কথাবার্তার জন্য একটা পরিবেশ তৈরি জরুরি। আপনি একই সাথে কথাও বলবেন, আবার মানুষকে হত্যা করবেন, তা হতে পারে না। আপনি মুখে বলছেন আলোচনার কথা, আর একই সাথে আপনি নিরীহ লোক মারছেন, প্রতিবাদ করতে দিচ্ছেন না। আপনি যদি সত্যি সত্যিই আলোচনা চান, তাহলে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করুন। শুধু তাই নয়, এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে আপনারা বিনা বিচারে জেলে আটকে রেখেছেন। তাদের ছেড়ে দিন। স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করছে, সেই হুরিয়ত কনফারেন্সের কিছু নেতাকে আপনারা জেলে পুরে রেখেছেন। ইয়াসিন মালিক জেলে। সাবির শাহ, মিরওয়াইজ ফারুক গৃহবন্দী। এছাড়াও আরও অনেকে নেতা জেলে রয়েছে। আপনি একদিকে বলছেন, কথাবার্তা চান। অন্যদিকে আপনারা তাদের জেলে পুরে রাখছেন। তাছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার আছে। বহু মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছে। একটা বড়ো সংগঠন আছে, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানুষের বাপ-মায়েদের সংগঠন। তারা ভারত সরকার এবং জম্মু কাশ্মীর সরকারের কাছে জানতে চায়, তাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়? এটা অনেক সমস্যা তৈরি করছে। হয়ত একজন পুরুষ, স্বামী, সে নিখোঁজ। সবাই মোটামুটি জানে, সে নিহত। কিন্তু সরকারি ভাবে সে জীবিত। এদের স্ত্রীদের আমরা বলি আধা-বিধবা। আইনিভাবে সে বিধবা নয়। কিন্তু এটা সবাই জানে, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পুরুষদের বেশিরভাগই মৃত। কিন্তু সেই বিধবা পুনর্বিবাহ করতে পারছে না। এরকম প্রচুর আছে। ওই সংগঠনের মতে, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানুষদের সংখ্যা ১৬০০০।

জম্মু ও কাশ্মীর অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত। একভাগে আছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর। তাছাড়াও আছে লাদাখ, জম্মু, কাশ্মীর। এই আলোচনা প্রক্রিয়াতে সমস্ত ভাগেরই অংশগ্রহণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

মন্থন : কীভাবে প্রতিনিধি বাছা হবে?

বে.ভা. : তার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। ভারত সরকারের নির্বাচন প্রক্রিয়াতে যারা অংশগ্রহণ করে, তারা জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের প্রতিনিধি নয়। কিন্তু তারা ছাড়াও অনেক রাজনৈতিক দল আছে। হুরিয়ত কনফারেন্স আছে। ভারত সরকার যদি কথোপকথনের পরিবেশ তৈরি করে, তখন মানুষ নিজেই ঠিক করে নেবে, কারা হবে তাদের প্রতিনিধি। আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদেরকেই প্রক্রিয়াটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু প্রথমে আপনি মানুষকে কথা বলতে দিন। জম্মু, কাশ্মীর, লাদাখের

---

১ ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ 'তাসখন্দ ঘোষণা'য় স্বাক্ষর করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান।

২ ২ জুলাই ১৯৭২ সিমলা চুক্তি হয়।

৩ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ ভারত সরকার 'কাশ্মীর চুক্তি' ঘোষণা করে। তার আগে ১৩ নভেম্বর ১৯৭৪ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং শেখ আবদুল্লার প্রতিনিধি হিসেবে জি পার্থসারথী ও মির্জা মহম্মদ আফজল বেগের মধ্যে 'কাশ্মীর চুক্তি' হল। বক্সি গুলাম মহম্মদ দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান সভাকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার অতীত সম্মতিদানকে শেখ আবদুল্লা মেনে নিলেন।

মানুষকে পরস্পরের সাথে আলোচনায় বসতে দিন। ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে সেই আলোচনার প্রক্রিয়াটাকে সহায়তা করতে হবে। তারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুক। তারা নিজেরা একটা সিদ্ধান্তে আসুক। সেই সিদ্ধান্ত যাই হোক, তা ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে মানতে হবে। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার একটা বড়ো কারণ কাশ্মীর। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে এই অঞ্চলে শান্তি কিন্তু আসবে না। তাই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কেবল কাশ্মীরের মানুষের চাহিদা নয়, সেটাতে ভারত এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের মানুষদেরও মঙ্গল। তাই এই দুই দেশ উদ্যোগ নিক সমস্যা সমাধানের এবং সেটার জন্য কোনও বিদেশি শক্তির — যেমন আমেরিকার — মুখাপেক্ষী হবার দরকার নেই। এই দুই দেশই তো পরস্পরের হাত থেকে নিরাপত্তার অজুহাতে অস্ত্রশস্ত্র বানাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সেসবের দরকার নেই। বদলে এরা সেই টাকা খরচ করুক না হাসপাতাল, স্কুল এসব তৈরিতে। পাকিস্তান খুবই গরিব দেশ। কিন্তু ভারতের মানুষও খুব একটা ভালোভাবে নেই। এখানে বৈষম্য খুব বেশি। প্রচুর মানুষ এখনও রয়ে গেছে দারিদ্র্যসীমার নিচে।

মন্থন : কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মত কী? তারা বর্তমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কী অবস্থান নিচ্ছে?

বে.ভা. : কাশ্মীরি পণ্ডিতরা সংখ্যায় খুবই কম, তুলনায় তাদের নিয়ে চর্চা বেশি। তাদের মোট সংখ্যা হয়ত লাখখানেকের মতো। এমনিতেই কাশ্মীরে হিন্দু জনসংখ্যা খুব কম। মোট তারা দেড় লাখের মতো। তাদের মধ্যে শিখও আছে। স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে দু' তিনজন পণ্ডিত নিহত হয়েছিলেন। তাঁরাও যে খুব নিরীহ লোক ছিলেন এমন নয়। যেমন, একজনের কথা বলা যেতে পারে, জঙ্গিরা তাঁকে মেরে দিয়েছিল, এন কে গাঞ্জু, বিচারক। তিনি জেকেএলএফ ('জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট)–এর প্রতিষ্ঠাতা এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মকবুল ভাটের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন।[৪] এছাড়াও পুলিশে কাজ করত, স্বাধীনতার আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছিল, এমন কয়েকজন কাশ্মীরি পণ্ডিত নিহত হয়েছিল জঙ্গীদের হাতে। কিন্তু এসবের অজুহাতে ভারত সরকার পরিকল্পনা করে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকা থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। আমি সেইসময় ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যপাল জগমোহনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন করা হচ্ছে এটা? উত্তর পেয়েছিলাম, এক) কারণ এরা জঙ্গীদের সহজ শিকার; এবং দুই) যেসব জায়গা থেকে সরানো হচ্ছে পণ্ডিতদের, সেখানে কিছু বিশেষ অপারেশন চালাবে সশস্ত্র বাহিনী। কাশ্মীরে মুসলিম এবং পণ্ডিতরা কিন্তু আলাদা আলাদা এলাকায় থাকে না। তারা একই সাথে থাকে। মিশ্র জনবসতি। তারা পরস্পরের প্রতিবেশী। ভারত সরকার পরিকল্পিতভাবে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে দেখানোর জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ব্যবহার করেছে। ভারত সরকার বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছে, এই আন্দোলন পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র। কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন, একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে আপনাকে তো বিভিন্ন দিক থেকেই সাহায্য নিতে হবে। এই আন্দোলন কাশ্মীরের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলন, অন্য কোনও রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র নয়। তারপর ভারত সরকার এটাকে একটা ইসলামিক প্রকল্প হিসেবেও দেখানোর চেষ্টা করেছে।

মন্থন : দু'বছর আগে কাশ্মীরে শোনা গিয়েছিল, পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একটা চেষ্টা হচ্ছে।

বে.ভা. : কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কিন্তু সবাই জম্মুর অস্থায়ী ক্যাম্পে নেই। তাদের একটা বড়ো অংশ দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। বেশিরভাগই বেশ বড়োলোক। বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দিচ্ছে। জম্মুতেও জম্মু প্রশাসন তাদের সরকারি চাকরি দিচ্ছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বোধহয় বিশ্বের সবচেয়ে আদুরে অভিবাসী। ভারতে অভিবাসীর অভাব নেই। বাংলাদেশ থেকে আসা, পাকিস্তান থেকে আসা পাঞ্জাবীরা — তাদের কেউ পাত্তাও দেয় না। জম্মুতেও তো প্রায় এক লাখ শিখ আছে, 'আজাদ কাশ্মীর' এলাকা থেকে চলে এসেছিল। তাদের কয়েকজনকে 'আজাদ কাশ্মীর'–এর পাক প্রশাসন মেরে দিয়েছিল। তখন তারা পুঞ্চ, রাজৌরি, মুজাফফারাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকা থেকে চলে আসে। পণ্ডিতদের জন্য যেমন সোহাগ রয়েছে, তাদের জন্য তা কিন্তু নেই। আজ তেষট্টি বছর হয়ে গেল, তারা শুরুতে এসে যেভাবে ক্যাম্প করে ছিল, তেমনই আছে। তাদের কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা দাবি করে, তারা কাশ্মীরের আদি বাসিন্দা। কিন্তু বেশিরভাগ কাশ্মীরি মুসলিমই তো আগে পণ্ডিত ছিল। তারা তো ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছে। তারা তো অন্য কোনও জায়গা থেকে আসেনি।

কাশ্মীরে পাঠানরা রাজত্ব করেছে, মোগলরা রাজত্বে করেছে, শিখরা রাজত্ব করেছে। কাশ্মীর উপত্যকা তো একবার মাত্র পঁচাত্তর লাখ টাকায় গুলাব সিংহের কাছে বিক্রিও হয়েছিল। তাই কাশ্মীরিরা চিরকালই আগ্রাসন ও দখলের মধ্যে থেকেছে। মূলত মুসলিম হলেও কাশ্মীরিরা কিন্তু পাঠান বা মোগল রাজত্বকে দখল বলেই মনে করে।

অভিবাসী কাশ্মীরি পণ্ডিতরা জানিয়েছিল, তারা উপত্যকায় ফিরবে, যদি কোনও একটি এলাকা কেবল পণ্ডিতদের জন্যই ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা তো একটা বোকামি। গোটা কাশ্মীরটাই তো তাদের জায়গা, তার বদলে তারা একটা কোণে থাকতে চাইছে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণ হল, তারা খুব সুবিধাপ্রাপ্ত। তাদের শিক্ষাদীক্ষার এলাহি বন্দোবস্ত, চাকরিবাকরির এলাহি বন্দোবস্ত। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত।

মন্থন : গতকাল সোপোর এলাকার একটা সিআরপিএফ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে।

বে.ভা. : কয়েকবছর আগে একটা স্কুল বিল্ডিংয়ে একটা আর্মি ক্যাম্পের বিরুদ্ধে মানুষ খুব প্রতিবাদ করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই আর্মি ক্যাম্পটি তুলে নেওয়া হয়। কী হয়েছিল জানেন? একটা বিল্ডিং থেকে পাশের বিল্ডিংয়ে ক্যাম্পটাকে সরানো হয়েছিল।

কাশ্মীরি পণ্ডিতরা মুসলিমদের চেয়ে অনেক ধনী। তারা সরকারি চাকরিতেও বেশি অনুপাতে ছিল, ১৯৪৭ এর আগে। তবে কাশ্মীরে এখনও কিন্তু বেশ কিছু পণ্ডিত আছে, বিশেষত জেলাগুলোতে এবং গ্রামে। হয়ত কেউ স্কুল চালায়। প্রায় আশি হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত এখনও কাশ্মীরের গ্রামগুলোতে রয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ হয়ত জঙ্গিদের হামলায় তাদের জমিজমা হারিয়েছে। তাদের সরকার থেকে সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু তার বদলে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়া পণ্ডিতদের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করছে। সেটা স্থানীয় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করছে।

গত বছর ইয়াসিন মালিক কোকরনাড় থেকে একটা শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা পদযাত্রা শুরু করেন। তাতে সম্প্রীতির কথা বিশেষভাবে এসেছিল। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথাও এসেছিল।

মন্থন : শোনা যাচ্ছে, পুরনো সব নেতারা নাকি এখনকার বিক্ষোভরত যুবকদের থেকে বিচ্ছিন্ন?

---

৪ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ 'জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট'–এর প্রতিষ্ঠাতা মকবুল ভাটের দিল্লিতে ফাঁসি হয় এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

বে.ভা. : যুবকেরা নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করছে। তাদের কোনও নেতা নেই। পুরনো নেতারা কীভাবে তাদের নেতৃত্ব দেবে? তারা তো সব বন্দী বা তাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত। এখনকার এই যুবকদের আন্দোলন দিশাহীন। এটা খুবই বিপজ্জনক দিক। সরকারই এদের এদিকে ঠেলে দিয়েছে।

মন্থন : কেউ তাদের সঙ্গে নেগোশিয়েট করার জন্য এগিয়ে আসছে না? শুনেছিলাম বার এসোসিয়েশন যুবকদের পক্ষে একটা প্রতিবাদের চেষ্টা করছে।

বে.ভা. : হ্যাঁ করেছিল। কিন্তু এখন তারা সবাই জেলে। ভারত সরকার সমস্ত নেতাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে একের পর এক কথা শুরু করেছে, তারপর হঠাৎ করে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে। যেন তারা কেউ নয়। যাতে আলি শাহ গিলানিই একমাত্র নেতা হিসেবে পড়ে থাকে। কিন্তু ওই আলি শাহ গিলানির উপত্যকায় কোনও প্রভাব নেই। লোকে তাকে নেতা হিসেবে মনে করে না। এছাড়াও ভারত সরকারের একটা কৌশল হল, চরমপন্থীদের উৎসাহ দেওয়া। যাতে সে প্রচার করতে পারে, ওই তো, আন্দোলনটা মৌলবাদী। গিলানি ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া, তাছাড়া পাকিস্তানের সরকার-প্রশাসনের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে। পাকিস্তানের মৌলনা মৌদুদি একবার ইসলামিক রাষ্ট্রের ব্যাপারে একটা মিটিং করেছিল, তালিবানরা সেখানে ছিল, গিলানি সেখানে গিয়েছিলেন।

মন্থন : গিলানির কাশ্মীরে খুব একটা সমর্থন নেই?

বে.ভা. : না, এখনও নেই।

মন্থন : তাহলে কাশ্মীরে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা কে?

বে.ভা. : শেখ আবদুল্লার মতো জনপ্রিয় নেতা এখন কেউ নেই। ইয়াসিন মালিক কিছুটা জনপ্রিয় ছিলেন। ভারত সরকার নেতাদের শেষ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু তাদের চিন্তাকে শেষ করে দিতে পারেনি। মানুষ এই যে এখন আন্দোলন করছে, যার কোনও নেতা নেই, কিন্তু পুরনো নেতাদের চিন্তা-আদর্শটা কিন্তু এই আন্দোলনে ফিরে এসেছে : স্বাধীনতা।

মন্থন : অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে? আপনি কি কিছু আঁচ করতে পারেন?

বে.ভা. : আমার মনে হয়, আশু ভবিষ্যতে আশাব্যঞ্জক কোনও কিছু ঘটবে না। কাশ্মীরের জন্য ভারত পাকিস্তান দু'দেশই ভুগছে। তারা বেশ বুঝতেও পারছে। কিন্তু ভারতে এমন কোনও নেতা নেই যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে ছাপিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। মনমোহন সিং বা সোনিয়া গান্ধীও পারছে না। কেউ কেউ বলেছিলেন, বাজপেয়ী পারবে। আমি তখন বলেছিলাম, অসম্ভব। বাজপেয়ী কে? তিনি তো আসলে চরম মৌলবাদী আরএসএস-এর লোক। তিনি স্বাধীন সত্তা নয়।

মন্থন : কাশ্মীরে সিপিআই সিপিএম কেউ আছে?

বে.ভা. : আছে, কিন্তু খুব একটা প্রভাব নেই। তারিগামি আছেন, সিপিএম নেতা।

মন্থন : আপনাদের খবরের কাগজ কাশ্মীর টাইমস বা এই ধরনের কাগজগুলোর হস্তক্ষেপ করার কোনও ক্ষমতা আছে?

বে.ভা. : নাহ্। ভারত সরকার আমাদের বিশ্বাস করে না। ১৯৯৬-৯৭ সালে কাশ্মীর টাইমসের কিছু ক্ষমতা ছিল। তারপর থেকে আর নেই।

কাশ্মীর : এক সমাধানহীন সমস্যা

রামরতন চ্যাটার্জি

দীর্ঘ চার বছর পর ২০১০ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি শ্রীনগরে পৌঁছালাম। পরদিন সকাল থেকেই দেখা হয়েছিল সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই আমার কিছু বই[৫] পাঠানো হয়েছিল শ্রীনগরে বিক্রির জন্য। খবর পেলাম বই আসা মাত্র বিক্রি হয়ে গেছে। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করলাম। এক কলেজশিক্ষক বললেন, 'কী বলব, ছেলেমেয়েরা বইটা শেষ করে তবে ঘর থেকে বার হয়েছে।' আমি একটু অবাকই হলাম। আমি বইটা তৈরি করেছিলাম গবেষকদের কথা মাথায় রেখে। সত্যি করে আমি অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের কথা মোটেই ভাবিনি। আমার মাথাতেও আসেনি যে কাশ্মীরের ছেলেমেয়েরা জম্মু ও কাশ্মীরের অতীতের এইসব খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে পারে। যাই হোক, তখন আমার মনে একটা খটকা লাগে। কিন্তু পরে যুবকদের এবারের আন্দোলনের পারদ যখন এপ্রিল থেকে ওঠানামা করতে করতে এক চরম পর্যায়ে পৌঁছাল জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে, আমি তখন জম্মুতে। আমি যেন আমার খটকার একটা আবছা উত্তর পেলাম।

নতুন বছরের জানুয়ারি থেকেই সাধারণ মানুষের হত্যা শুরু হয়েছিল, মাঝেমাঝে, এক-একজন করে। ৩০ এপ্রিল রাজপুত রেজিমেন্টের জওয়ানরা তিনজন কাশ্মীরিকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে দেয়। জায়গাটা ছিল শ্রীনগর থেকে একশ কিলোমিটার দূরে — মাচিল, নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে, কুপওয়ারা জেলাতে। বলা হয়, ওরা এনকাউন্টারে মারা গেছে। পরবর্তীকালে জনসাধারণের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, ভুয়া সংঘর্ষ, ফেক এনকাউন্টার। ওইসময় আমি এখানেই ছিলাম। গত বিশ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে কয়েক হাজার ফেক এনকাউন্টার হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত পাথরিবাল ফেক এনকাউন্টার।

১৫ আগস্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে আর একবার সজোরে ঘোষণা করলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় পতাকা তোলার পর তাঁর প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ করে এক ছাঁটাই হওয়া পুলিশ অফিসার সজোরে আজাদির শ্লোগান তুলে আরও একবার ভারতবাসীর সামনে কাশ্মীর সমস্যাকে খোলামনে দেখার আবেদন তুলে ধরলেন।

১৯৩১ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথেই ছিল। নেতৃত্ব কখনই জনসাধারণকে হিংসাত্মক আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়নি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট' JKLF যখন সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক নিয়ে হাজির হল, মানুষের মধ্যে সাড়া পায়নি। জম্মুতেও ১৯৮৩-৮৪ সালে 'স্যাফ্রন টাইগার' নামে এক সশস্ত্র সংগঠন তৈরি হয়েছিল। পুলিশের ধরপাকড়ের ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। মহম্মদ সরাফ সরতাজ এই সংগঠনের নেতা ছিলেন। এখন তিনি ছোটো একটা উর্দু দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। নিজে শান্তিপূর্ণ পথে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক কাজে যুক্ত আছেন।

সাধারণ কাশ্মীরিরা মনে করে, তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য শেখ আবদুল্লার পরিবার দায়ী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু যখন জম্মু

---

৫ রামরতন চ্যাটার্জির লেখা Kashmir : Freedom Thoughts, Struggle and Tyranny বইটি জুন ২০০৯-এ দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন, শুধুমাত্র গায়ের জোরে, তিনি কোন নৈতিকতার ধার ধারলেন না। ১৯৫৩ সালের ৯ আগস্ট থেকে কাশ্মীর বারবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে এবং পরবর্তী প্লেবিসাইট (গণভোট) আন্দোলনে ১২০০ কাশ্মীরি প্রাণ দিয়েছিল। এত ত্যাগ স্বীকার করার পর তারা কী পেয়েছিল? শেখ আবদুল্লার প্রতারণা। ১৯৭৫ সালে দিল্লির কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ কাশ্মীরিদের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত করে।

শুরু হয় নতুন করে জেগে ওঠার আরাধনা, নতুন পথের সন্ধান। কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে গড়ে উঠেছিল ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দল। কেউ সশস্ত্র, কেউ শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শেখ আবদুল্লার বংশগত শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলন চলতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে 'মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট' নামে এক রাজনৈতিক দলের উত্থান। শেখ পরিবারকে এরা জনসাধারণের প্রধান শত্রু মনে করত। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের বহুমুখী কূট চক্রান্তের ফলে মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট ১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল, এক ঘৃণিত রিগিং-এর মাধ্যমে। এই দিনটি কাশ্মীরি মনে ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ১৯৮৮ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে হাজার হাজার কাশ্মীরি তরুণ ভারতীয় শাসকদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। সেদিন কাশ্মীরিরা ভারতবাসী বা বিশ্ববাসীর কাছ থেকে তাদের এই গণআন্দোলনে কোন সাড়া পায়নি। বরং কাশ্মীরিদের ওপর পাকিস্তানি, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী মুসলমান লেবেল এঁটে সকলকে ধোঁকা দিতে পেরেছিল দিল্লির শাসকেরা। প্রচণ্ড শক্তিশালী ভারতীয় সমরশক্তির সামনে ব্যর্থ হয় সেদিনের কাশ্মীরি যুবশক্তির সশস্ত্র প্রতিরোধ। নেমে আসে এক হতাশাময় অধ্যায়, ২০০২ থেকে ২০০৮।

২০০৮-এর অমরনাথ জমি বিতর্ককে কেন্দ্র করে আবার কাশ্মীরি যুব সম্প্রদায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনের সারিতে চলে আসে। এবার এগিয়ে আসে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজন্ম। তারা অস্ত্রত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ পথে আজাদির শ্লোগান নিয়ে আবার রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভারত সরকার কোনরকম আলোচনা চালাতে নারাজ। মুখে ন্যাশনাল মিডিয়ার মাধ্যমে আলোচনার ভণিতা করে তারা কাশ্মীরি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রকাশ্য ও গোপন হত্যালীলা চালিয়ে যেতে থাকে। কাশ্মীরের আন্দোলনকারীদের জোট হুরিয়ত কনফারেন্সের মিরওয়াজ গোষ্ঠী এবং JKLF-এর ইয়াসিন মালিক গোষ্ঠী ভারত সরকারকে আলোচনার টেবিলে আনতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ এরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র মাইসুমা ও জামা মসজিদ এলাকায় এরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান-পন্থী সৈয়দ আলি শাহ গিলানি সাহসের সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ২০০৯-এ জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনে জনসাধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিচ্ছেদকামী নেতৃত্বকে ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট বেঁধে সরকার গঠন করে। কিন্তু কংগ্রেস এবং শেখ আবদুল্লার বংশধর ফারুক ও ওমরকে কখনই কাশ্মীরিরা নিজেদের লোক বলে বিশ্বাস করেনি।

এখন ২০০৮ থেকে যে আন্দোলনের পর্যায় চলছে, তার পিছনে রয়েছে কাশ্মীরি মানুষের এক পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। শেখ আবদুল্লার বংশগত শাসনের বিরুদ্ধে আর ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত রাষ্ট্রের পুতুল সরকার গঠনের অবিরাম চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাদের এই ক্ষোভ। যতক্ষণ না এই পুতুল সরকার গঠনের চক্রান্ত বন্ধ হবে, ততক্ষণ কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। নতুন বংশধর ওমর আবদুল্লা পিতামহ ও পিতার ঐতিহ্যের পথ ধরে কংগ্রেসের সহযোগিতায় শুরু করে কাশ্মীরিদের ওপর নতুন করে হত্যার অধ্যায়। কারণ অত্যাচারের মাধ্যমে কাশ্মীরিদের ভারতীয় বানানোর নীতি থেকে দিল্লির শাসকেরা সরে আসেনি। ভারতীয় না হয়েও যে বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজে মিলেমিশে থাকা যায়, এরকম এক বৃহতের সাধনায় ভারত সরকার এবং ভারতের বড়ো বড়ো দলগুলো কেউই বিশ্বাস করে না। আজ চার হাজার বছরের পুরনো এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর না আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা, না তাদের নিজস্ব রাজ্য। আছে শুধু দিল্লির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিছু শিক্ষিত দালাল NGO, যারা নানা কায়দায় ধোঁকা দিয়ে এই জনগোষ্ঠীকে দিল্লির কব্জায় রাখতে চায়। এই দমবন্ধ করা অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আজ উপত্যকার যুবসমাজ এগিয়ে গেল লাগাতার আন্দোলনে; বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুকের নলের সামনে। মৃত যুবকদের মধ্যে একজনও নেই যার পিঠে গুলি লেগেছে, সবাই মাথা বুক বা শরীরের সামনের অংশে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন রাজনৈতিক নেতা জেলের বাইরে ছিল না। আর থাকলেই বা কী হত? অবশেষে ভারত সরকার বাধ্য হল তাদের মতে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানিকে কারামুক্ত করতে এবং তাঁকে দিয়েই যুবকদের কাছে আন্দোলন বন্ধ করার দাবি জানাতে। এক যুবকের কাছে যখন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, সে বলল, 'গিলানি কে? এখন আমাদের আন্দোলন রাস্তায়, টেবিলে নয়, আমরা রাস্তাতেই এর সমাপ্তি ঘটাতে চাই'। গিলানি পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করে আবেদন করার পরেও যুবকেরা থামেনি।

মন্থন সাময়িকীর পাঠকসভা

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় ১১২-এইচ সেলিমপুর রোড, কলকাতা ৩৩ (সেলিমপুর রেলগেটের কাছে, দূরভাষ ২৪১৪৭৭৩০) ঠিকানায় প্রত্যেক পাঠককে এই সভায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী

বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, ডাক : বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

যাঁরা পাঠকসভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তাঁরা ডাকযোগে, দূরভাষে অথবা ই-মেল মারফত মতামত পাঠান।

পশ্চিমবঙ্গের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কি আর গরিব নয়?

অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়

নীলাঞ্জন দত্ত সম্পাদিত এবং শ্রেয়া পাবলিকেশন দ্বারা প্রকাশিত 'বিয়ন্ড ডেভলপমেন্টালিজম' বা 'উন্নয়নবাদ পেরিয়ে' নামক প্রবন্ধ সংকলন থেকে নেওয়া অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই প্রবন্ধটির নাম 'নট পুয়োর এনি মোর? উইমেন ইন সেল্‌ফ-হেল্প গ্রুপ্‌স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'। অনুবাদ করেছেন তমাল ভৌমিক।

বিশ্বায়িত দুনিয়ায় নারী-শ্রমিকদের প্রদর্শনীটা কেমন? এই প্রশ্নে মনের মধ্যে একটা চীনা মহিলার ছবি ভেসে ওঠে, যিনি একটা বহুজাতিক সংস্থার কারখানায় একগাদা শ্রমিকের ভিড়ে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসে এমন সব জুতো বা খেলনা বানাচ্ছেন, যেগুলো কোনদিন তিনি তাঁর বাচ্চাকে কিনে দিতে পারবেন না। 'এক্সপোর্ট জোনগুলো'-তে মহিলারা কম মজুরিতে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চলেছে — এটাই বিশ্বায়িত দুনিয়ার নারী শ্রমিকের পরিচিত চেহারা। এরকম চেহারার একটা মূর্তি হওয়ার দাবিও করতে পারেন না বেগম বাহারুন। বেগম বাহারুন থাকেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বাগনান মহকুমায়। সন্ধ্যেবেলা খাবার খেয়ে তিনি তাঁর খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘরে শাড়ির পাড়ে জরির কাজ করতে বসেন ধোঁয়া ওঠা কেরোসিন তেলের লম্ফোর সামনে। এই শাড়ি স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে চলে যাবে অনেক দূরে, অথবা হয়ত নিকটতম মহানগরী কলকাতায়। এই নারীর এই জীবিকা অর্জনও কিন্তু বিশ্বায়নের আওতার বাইরে নয়। মিষ্টির দোকানগুলোর মতো, যত্রতত্র স্বনির্ভর গোষ্ঠী (সেলফ হেলপ গ্রুপ বা এস এইচ জি) গজিয়ে তোলা হয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্কের মতো কিছু আর্থিক সংস্থার উন্নয়নের ফরমুলা মোতাবেক। এবং এরই ফলাফল হল বাহারুনের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ আর সামান্য কিছু আয়।

ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রধান রূপ হল, মহিলাদের এই স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলো। এগুলো সাধারণত ১০-২০ জনের এক একটা ছোটো গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠী তার সদস্যদের সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে এবং তাদেরকে ঋণও দেয়। এই গোষ্ঠীগুলো ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ নেয় এবং সেই ঋণের টাকা থেকে সদস্যদের ধার দেয়। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তটি এমন একটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে যা সাহায্য করেছে এনজিওগুলোকে বিশ্বজুড়ে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে। ভারতবর্ষে এনএবিএআরডি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগসূত্র গড়ে তোলার ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ১৯৯২ সাল থেকে। এদের লক্ষ্য ছিল ২০০৮ সালের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে গরিব মানুষের দশ কোটি জনকে এই ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ঋণ পৌঁছে দেওয়া। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এগিয়ে এল। 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা' বা ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন নামে বিশ্বব্যাঙ্কের যে শাখাটা সুদ ছাড়া ধার ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে তারা ১৯৯০ সাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য কয়েক হাজার লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিল। এবং সেই টাকায় স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা এবং গোষ্ঠী সদস্যদের নানারকম কাজে দক্ষ করে তোলার জন্য স্বরোজগার যোজনা (এসজিএসওয়াই) চালু হয়েছিল। সেটা ছিল ভারতবর্ষের গরিবদের জন্য সর্ববৃহৎ স্ব-নিয়োগ কর্মসূচি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গে ২০০০ সালে এই এসজিএসওয়াই কর্মসূচী গ্রহণ এবং একইসাথে 'কেয়ার-ওয়েস্টবেঙ্গল'-এর 'ক্রেডিট অ্যান্ড সেভিংস ফর হাউসহোল্ড এন্টারপ্রাইজ' (সিএএসএইচই) প্রকল্প গ্রহণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে বিস্তৃত জায়গায় গড়ে উঠতে সাহায্য করে। আজ পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা সাত লক্ষ এবং তাদের সদস্য সংখ্যা সত্তর লক্ষ, যার মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা।[১]

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর কৃতিত্বে রাজ্য সরকার একেবারে আপ্লুত। ২০০৮ সালের মে মাসে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়, তার এক বছর আগে থেকে কলকাতার ধনী এলাকাগুলো ছেয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে — সেখানে গ্রামীণ মহিলাদের উজ্জ্বল মুখ, তারা ঘোষণা করছে, 'আমরা এগিয়ে চলেছি স্ব-নির্ভরতার দিকে'। বিশ্বব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলোর সাফল্যের গল্পে পরিপূর্ণ, যার মধ্যে চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের অভিজ্ঞতা সামনের সারিতে রয়েছে। ভারতে গ্রামাঞ্চলের এই সব 'ঝকঝকে' ছবির বড়ো বড়ো গপ্পো যথেষ্ট ছোটো হয়ে গেছে এই দশকের মাঝামাঝি যখন গরিব মেয়েদের জীবনে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব নিয়ে একগুচ্ছ সংযত সমীক্ষা চালিয়েছে বেশ কয়েকটি সংস্থা। এইসব সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে মহিলাদেরকে সামাজিকভাবে জড়ো করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে এদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা ও রাজস্থানে ২০০৬ সালের এক বহুল প্রচারিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলোতে যোগ দেওয়ার সাত বছর পরেও এইসব গোষ্ঠীর সদস্যদের অর্ধেক গরিব এবং তের শতাংশ খুবই গরিব অবস্থায় রয়ে গেছে।[২]

২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গেও একটা সমীক্ষা করা হয় এবং তাতে নানারকম পদ্ধতির সহায়তায় সাতটা জেলার ৩৭৬টি পরিবার, যারা এই ধরণের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করে ওই একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, পরিবারের আয়ে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত সদস্যের অবদানের পরিমাণ কম (৪২.৩ শতাংশ পরিবারে শতকরা ১০ ভাগের নিচে এবং ৭৫ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগেরও কম)। প্রায় ৪৫ শতাংশ পরিবার বছরে এক মাসেরও বেশি খাদ্যের অনিশ্চয়তায় ভুগেছে, ৯৪ শতাংশ জ্বালানি হিসেবে গোবর ব্যবহার করে এবং ৬ শতাংশ শিশুরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।[৩]

তাহলে কেন চাকরি জোগাড় আর দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীকে বারবার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে? কেউ এমন যুক্তি দিতে পারে যে এর কারণ হল সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হাতে সমস্যা সমাধানের আর কোনও উপায় নেই। খুব বেশি সংখ্যক শ্রমিকের অসংগঠিত ক্ষেত্রে চলে যাওয়া, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারা, গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয় কমে যাওয়া বা এক জায়গায় আটকে থাকা, অপুষ্টির বিস্তার এবং নারী ও শিশুদের রক্তাল্পতা চলতেই থাকা — এই সমস্তর মধ্যে দিয়েই অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে 'সার্বিক' করার ক্ষেত্রে ভারতের উদারিকৃত অর্থনীতির ব্যর্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাকরির নতুন নতুন জায়গা তৈরি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের দুটি নিদান রয়েছে — শিল্পায়ন ও স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী।

কিন্তু উন্নয়নের উপায় হিসেবে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার পিছনে শুধু একটা অসহায় তাড়না কাজ করেনি, একটা ন্যায্যতার একটা নিরপেক্ষতার বোধও কাজ করেছিল। যুক্তিটা ছিল এরকম যে বেশির ভাগ গ্রামীণ মহিলা পরিবারের উপার্জনে কোনরকম অংশ নেয় না। এই ভাবনা থেকেই তারা পরিবারের জন্য যেটুকু আয় করতে পারে তাকে 'প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কাজকর্ম' বলে দেখা হয়। যে 'প্রকল্পে' মহিলারা অংশ নিচ্ছে

তার সাফল্য মাপা হয় তারা কতটুকু আয় করছে তাই দিয়ে, কিন্তু কতটা শ্রম তারা দিচ্ছে বা কতক্ষণ ধরে তার কাজ করছে সেগুলোকে হিসেবের মধ্যে আনা হয় না।

'জীবিকার সন্ধানে স্ব-নির্ভর দল' নামক একটি সমীক্ষার রিপোর্টে এই উদাহরণটাকে দেখা যাক। বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকে চারটে গোষ্ঠী মিলে একটা নার্সারি বা বাগানের পরিকল্পনা করে। সেখানে তারা পঞ্চাশ হাজার গাছের চারা লাগাবে এবং চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ — এই তিনমাসে কাজটা শেষ করবে বলে তারা ঠিক করে। রিপোর্টের লেখক মানব সেন লিখছেন, 'গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর গরমে এই মহিলারা কঠিন পরিশ্রম করে পাঁচশ' ফুট দূর থেকে জল এনে এনে চারাগাছগুলোয় দিয়েছিল।' তাদের মোট আয় হয়েছিল আটত্রিশ হাজার দু'শ একচল্লিশ টাকা। এই 'সফলতার গল্পটি'কে আরেকটু কাছ থেকে দেখা যাক।

ধরা যাক, চারটে গোষ্ঠীতে কম করে চল্লিশজন মহিলা ছিল, যাদের প্রত্যেকে ওই তিনমাসে নয়শ' ছাপ্পান্ন টাকা আয় করেছিল, অর্থাৎ প্রত্যেকে মাসে তিনশ' আঠারো টাকা আয় করেছিল। বীরভূমে গ্রীষ্মের ওই প্রখর তাপে এরকম একটা হাড়ভাঙা খাটুনির প্রকল্পে ওই অতটুকু টাকা উপার্জনের জন্য এরকম একটা কর্মসূচীর প্রস্তাবনা করতে যথেষ্ট স্নায়ুর জোর লাগে, তারপর আবার পরিবারের অর্থনীতিতে কিছু 'অবদান' রাখতে পারার জন্য মহিলাদের প্রশংসা করতে অনেকখানি কাণ্ডজ্ঞানের দরকার হয়।

গোটা রাজ্য জুড়ে যেসব স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী আছে তার বেশিরভাগগুলোতে বেশিরভাগ মহিলার এই একই কাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের সফলতার গল্পে মহিলাদের পরিচালিত দু'টো সমবায় সমিতি রয়েছে, যে দু'টোর মধ্যে কয়েকশ' স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী আছে। 'বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' এবং 'তমলুক ১ মহিলা বিকাশ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' — এই দুই সমবায় সমিতির সদস্যরাই বলেছে যে, মেয়েরা সবাই জরির এমব্রয়ডারির কাজ পছন্দ করে, কারণ প্রত্যেক শ্রমিক মাসে ২০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারে, যা কিনা পোল্ট্রির বা সব্জি বেচার কাজে যে আয় হয় তার থেকে অনেকটাই বেশি। কিন্তু ওই আকাঙ্ক্ষিত ২০০০ টাকা উপার্জনের জন্য তাদের কতক্ষণ ধরে কাজ করতে হয়? বাগনানের বেগম বাহারুনের কথায়, মহিলাদের সারাদিন কাজ করতে হয়, শুধু সকালে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানো ও দুপুরে রান্না করার সময়টুকু ছাড়া। তাঁর ভাষায়, 'মেয়েরা যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ কাজ করে'। তমলুকের অর্চনা পাত্র বলেন, মেয়েরা সকাল ৫-৩০ থেকে বেলা ১১টা অবধি কাজ করে, তার পর দেড়টা থেকে বিকেল চারটে, আবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা। তাঁর হিসেবে তাঁরা দিনে ৩০ টাকার বেশি পান না, আর ঘন্টার হিসেবে প্রতি ঘন্টায় ২ থেকে ৪ টাকা।

'সচেতনা' নামে কলকাতা ভিত্তিক একটা নারী অধিকার গোষ্ঠী আছে। 'সচেতনা'র প্রতিষ্ঠাতা নির্মলা ব্যানার্জি একজন নারীবাদী অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, 'মহিলাদের জন্য যে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তার গোড়ায় গলদ আছে। যে মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা হল মহিলারা কোনও কাজ করে না, অতএব যে কোনও কাজ, তাতে যতটুকুই আয় হোক, তা মহিলাদের আকৃষ্ট করবে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছাগল বা মুরগি পোষা, বিড়ি বাঁধা বা কাগজের ঠোঙা বানানো ইত্যাদি খুব অল্প আয়ের কাজেও কম করে তিন চার ঘন্টা সময় লেগে যায় আর সব মিলিয়ে মেয়েদের সংসারের মোট কাজের বোঝা আরও ভারী হয়ে পড়ে।'

কাজের বোঝা ঠিক কতটা ভারী? 'সচেতনা'র একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে গ্রামের গরিব পরিবারের মহিলারা মাঝরাত্রি থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত মাত্র বিশ্রাম নিতে পারে। যেহেতু শুধুমাত্র প্রধান পেশা থেকে যে আয় হয় তাই দিয়ে একটা পরিবারের খরচ চালানো যায় না, তাই রোজকার গৃহস্থালী কাজের পরেও মহিলাদের অন্ততঃ তিনরকমের অর্থকরী কাজ করতে হয়। ব্যানার্জি একজন মহিলার উদাহরণ দিয়েছেন, যার সারাদিনের কাজ সারাদিন ধরে একদল গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছে। এই মহিলার স্বামী ঝিঙে চাষ করেন। মহিলা খুব ভোরে উঠে রান্না করে বাচ্চাদের খাইয়ে স্কুলে পাঠান। তারপর ঘর পরিষ্কার করে ঘরের অন্যান্য কাজ করেন। তিনি ঘরের লাগোয়া একটা ছোটো মুদিখানার দোকান চালান। যখনই কোনও খরিদ্দার এসে দেশলাই বা তেল চায় তখনই তিনি গিয়ে সেটা দিয়ে আসেন। এর সাথে সাথেই তিনি তাঁর পোষা মুরগির দেখভাল করেন। সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, যেই তাঁর স্বামী এসে বললেন, সবজিগুলো তাড়াতাড়ি তুলতে হবে, অমনি তিনি স্বামীর সঙ্গে ছুটলেন ঝিঙে তুলতে।

২০০৭-এর জুন থেকে ২০০৮-এর মে মাসের এই সমীক্ষায় মালদহ, বীরভূম, ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা — এই তিন জেলার ২০টা গ্রামে সমীক্ষাটা চালানো হয়। এই সমীক্ষায় শুধু মহিলারা কতঘন্টা কাজ করছেন তার পরিমাণ হিসেব করা হয়নি, পাশাপাশি তাদের রোজকার কাজের একটা চলমান বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে :

'বেশিরভাগ মহিলা বহুক্ষণ ধরে গৃহস্থালী কাজকর্মেও ব্যস্ত থাকে। এমনকী, প্রায়ই তারা দিনে একবারের খাবার রান্না করলেও তাদের ব্যস্ততা কমে না। কারণ তাদের রান্নাবান্না করার ও সংসারের অন্য কাজকর্ম করার সরঞ্জামের খুবই অভাব। সাধারণভাবে প্রত্যেকেরই একটা বা দুটো বালতি এবং জল জমিয়ে রাখার জন্য কোনও পাত্র বা ড্রাম নেই। ফলে বহুবার ছোটাছুটি করে ঘরের জন্য জল আনতে হয়। এইভাবে টিউবওয়েল বা পুকুর থেকে জল নিয়ে আসতে প্রত্যেকবার ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে। এর সঙ্গে যদি গৃহপালিত পশু থাকে তাহলে তাকে খাবার ও জল খাওয়ানোর জন্য বারেবারে এদিক ওদিক নিয়ে যেতে হয়। জ্বালানি জোগাড় করা আর একটা বড়ো ঝামেলা। কেউই জ্বালানি কেনে না। মহিলারা ঘুরে ঘুরে গোবর, কৃষিজ বর্জ্য, ডালপালা, কাঠকুটো সংগ্রহ করে। তারপর তারা সেগুলো দিয়ে ঘুঁটে, কয়লার গুঁড়ো, পাটকাঠি বা অন্য কৃষিজ বর্জ্যের জ্বালানি তৈরি করে। কাজটা বেশ খাটুনির এবং এর পরেও জ্বালানিগুলো এত কম শক্তিসম্পন্ন হয় যে রান্না করতে অনেক সময় লাগে এবং আগুনের আঁচ যাতে না পড়ে যায় তাই সর্বদা সেদিকে নজর রাখতে হয়।[৪]

এই ধরনের একটানা কঠিন পরিশ্রমের কাজ সব সমীক্ষার মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে। কারণ অর্থনীতিবিদরা এগুলোকে 'কাজ' মনে করেন না। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা কাজের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য সূচিত করেন যা পূরণ করা মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে, কোনও কর্মপ্রক্রিয়াকে 'কাজ' হিসেবে ধরা হবে যখন কোনও ব্যক্তি সেটা অনেকক্ষণ ধরে করছে বা সেই ব্যক্তির নিজস্ব সময়ের বেশিটা ধরে করছে। কিন্তু মহিলারা তাদের কাজকে নানা ধরনের কর্মে ভাগ করে সম্পন্ন করে এবং সেগুলো করে গৃহকর্মের পাশাপাশি। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বেশিরভাগ সময়ে তারা কী করে, তাহলে তার স্বাভাবিক উত্তর হয়, 'ঘরের কাজ'। পরিবারের চাষের জমিতে গিয়ে কাজ করা বা মুরগি পালার জন্য কোনও পয়সা পাবে — এমনটা তারা আশাও করে না। যখন কোনও মহিলা পারিবারিক কোনও হাতের কাজ, যেমন তাঁতবোনায় হাত লাগায়, তখন ওই কাজে তার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোনও কিছু তাকে শেখানো হয় না। মহিলাদের সরল কর্ম সবসময়েই সামান্য কিছু মূল্য পেয়ে থাকে।

এই ধরনের লুকোনো শ্রমকে কাজ না মনে করার ফলশ্রুতিতেই মহিলাদের শ্রমকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই নানারকম প্রকল্প গড়ে ওঠে এবং সেসব বিভিন্ন 'প্রকল্পে' মহিলাদের নানারকম কাজের ট্রেনিং দেওয়া হয় আর সেসব কাজে দৈনিক ৩০–৪০ টাকার বেশি আয় কখনওই হয় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলপি থানার চকদুলালপুরের রিতা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে তাঁদের গোষ্ঠীটাকে গামছা বোনা শেখানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে বিনাপয়সায় তাঁতও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তারা বুঝে গেল যে প্রত্যেকটা গামছায় লাভ থাকে মাত্র পাঁচ টাকা আর একজন মহিলা দিনে পাঁচ ছ'টার বেশি গামছা বুনতে পারে না। যে পঁচিশজনকে ওই কাজ শেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে সাতজন এখনও গামছা বোনার কাজ চালাচ্ছে। অন্যরা তাঁত বন্ধ করে ফেলে রেখেছে। স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য পরিকল্পিত 'প্রকল্প'গুলো সবই এরকম বিশেষ ধরনের শ্রমনিবিড় ও স্বল্প আয়ের কাজকর্ম — সেলাই, পোলট্রি বা মুরগি পালা, সবজি উৎপাদন, বিড়ি বাঁধা, পাতার থালা বানানো, গাছের চারা লাগানো ইত্যাদি। এইসব কাজে নিযুক্ত মহিলাদেরকে তাদের উৎপন্ন জিনিসগুলো বাজারে কীভাবে বিক্রি করতে হবে তা শেখানো হয় না বা শহরের বাজারে যেতে দেওয়া হয় না। এরা এদের তৈরি জিনিস, হয় স্থানীয়ভাবে বেচে, বা স্থানীয় দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়।

অবশ্যই স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীগুলো মহিলাদের জন্য কিছু ভালোও করেছে। অনেক সফলতার গল্প, অনেক গর্বের মুহূর্তও আছে — যেমন কয়েকজন মহিলা স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীতে তাদের কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে, 'আমাকে আমার স্বামীর কাছ থেকে আর টাকা চাইতে হয় না', 'আমিই আমার ছেলের স্কুলের আর মেয়ের টিউশনের মাইনে দিই', বা 'আমার ছেলেকে ব্যবসা করার জন্য আমিই টাকা দিয়েছি'। স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীগুলো থেকে মহিলারা সহজেই অল্পস্বল্প ঋণ পায় বলে অনেক পরিবারের ধার–কর্জের ভার অনেকটা কমে গেছে। গোষ্ঠীগুলো মহিলাদের সামাজিকভাবে মেলামেশা করার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠেছে এবং হাজার হাজার গৃহবধূকে ঘরের বাইরে গিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে এই গোষ্ঠীগুলো অভূতপূর্বভাবে সহায়তা করছে। স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য অনেক মহিলা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে এবং আগের থেকে এখন অনেক বেশি মহিলা গ্রাম সংসদে আসে, কেউ কেউ অসাধারণ নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছে; শিশুদের টিকা দেওয়া, নারীপাচার আটকানো, ঘরের মধ্যে মেয়েদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা ইত্যাদি বহু সামাজিক বিষয়ে মহিলারা এগিয়ে এসেছে। কিছু কিছু স্ব–নির্ভর গোষ্ঠী মদের নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে ও স্থানীয় মদের ভাটি ভেঙে দিয়েছে।

এইসব সামাজিক আলোড়নের মধ্যে দিয়ে মহিলারা যা অর্জন করতে পারতো তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা গিয়েছে, কিন্তু প্রশাসন ও সমাজের সঙ্গে তাদের সংযোগ অবশ্যই মহিলাদের অনেকের ভিতরে নিজের ওপর আস্থা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মহিলাদের কাজের মূল্য পাওয়ার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর যে সার্বিক ব্যর্থতা তা কিন্তু এই ধরনের সামাজিক লাভগুলো দিয়ে ঢাকা যায় না। বরং এর বিপরীতে সরকার মহিলাদের ব্যবহার করেছে কম মাইনের একটা চাকরির বাজার তৈরি করতে। স্কুলগুলোতে যে মিড–ডে মিলের ব্যবস্থা আছে তা স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে অসম্ভব কম টাকা দেয়। এইরকমের কাজ, যা স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যকে সারা মাস এক স্কুলভর্তি বাচ্চার জন্য রান্না করা ও স্কুল পরিষ্কার করার কাজের মাইনে হিসেবে মাসের শেষে ২০০–২৫০ টাকার বেশি কখনও দেয় না, সেই কাজও গ্রামে খুব দামি কাজ এবং স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীগুলো এই কাজই পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া–মারামারি করে।

নির্মলা ব্যানার্জির মতে, এই অবস্থার কারণ হ'ল স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সফল করে তোলার জন্য সরকার যা যা করবে বলে কথা দিয়েছিল, তার কোনটাই রাখেনি। এসজিএসওয়াই গোষ্ঠীর মহিলাদের নতুন ধরণের সংস্থা গড়ে তুলতে কোনও উৎসাহ দেওয়া হয়নি, তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও দেওয়া হয়নি — যেমন বিদ্যুতের সরবরাহ বা রাস্তা বানিয়ে দেওয়া। এইসব মহিলাদের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও সদর্থক প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়নি। ফলত, মহিলারা সেই ধরনের জিনিসেরই উৎপাদন করে চলেছে যে ধরণের জিনিস বিক্রি করে খুব কম পয়সাই পাওয়া যায়।

বর্তমানে, আমরা দেখতে পাই, স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর সার্থকতা ও প্রযোজ্যতার মূল্যায়ন এমনভাবে করা হয় যাতে সার্থকতাটাই প্রমাণিত হওয়ার মতো প্রশ্ন মহিলাদেরকে করা হয়। যেমন, তাদের 'আত্মশক্তির অনুভূতি' নিয়ে অথবা গোষ্ঠীগুলোর 'সামাজিক বৈচিত্র্য'কে প্রশংসা করে। এইরকম ধরনের সমীক্ষার ফলাফল পাঠ করে একজন এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করে যে সমীক্ষকরা গরিবদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আর একটা ঝোঁক আছে স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের অন্য প্রান্তগুলোর মূল্যায়ন করা। এরকমই একটা প্রান্ত হল, তাদের 'দুর্যোগ মোকাবিলার তৎপরতা'। হ্যাঁ, এক বিচারে এগুলোর দাম আছে, কিন্তু এতে স্ব–নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার যে মূল উদ্দেশ্য সেই মহিলাদের উদ্যোগের উন্নয়ন ও একটা লাভজনক কর্মস্থল তৈরি করা কোনও গুরুত্ব পায় না।

(ঋণ দেওয়ার পরিমাণ, ঋণ শোধের খতিয়ান ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়কে বাদ দিয়ে) বছর ভিত্তিকভাবে মানব উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ও সামাজিকভাবে কতটা ক্ষমতা বেড়েছে এসবের বিচারে স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাবের মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নিশ্চয়ই মহিলাদের দারিদ্র্য দূর করতে পারে এবং তাদের নিজস্ব আয়ের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ আরও বাড়াতে পারে। কিন্তু তা করার জন্য কী কী শর্ত প্রয়োজনীয় এবং কোন কোন বাধার সম্মুখীন তা হয়ে পড়তে পারে তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সমৃদ্ধির ফাঁপা প্রতিশ্রুতি দরিদ্র মহিলাদের প্রতি এক নিষ্ঠুর উপহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সূত্র :

১| **Sen, Manab and Sircar, Ashok, 'Self Help Groups and Micro Finance in West Bengal', Kolkata, Lok Kalyan Parishad, 2006. p. 2.**

২| **EDA and APMAS, 'Self Help Groups in India: A Study of the Lights and Shades', 2006.**

৩| **Sen and Sircar, ibid, p. 128-129.**

৪| **Sachetana, 'Malnutrition and Rural Women of West Bengal : A Study from Policy Perspective', Kolkata, 2008, p. 22.**

বাতিল শ্রমিক

অমিতা সান্যাল

চ্যাটার্জিদার পুরো নাম কাশীনাথ চ্যাটার্জি। তারাতলা রোডে নেচার পার্কের ঠিক পাশে 'ক্রেবস অ্যান্ড সাই' নামে যে ছোটো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, চ্যাটার্জিদা সেখানকার একজন পার্মানেন্ট শ্রমিক ছিলেন। একজন দক্ষ ওয়েল্ডার। যখন ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, উনি থাকতেন বজবজ রোডে ১৩এ বাস স্ট্যান্ডের কাছে শম্পা মির্জানগর হাউজিং এস্টেটে। সাইকেল চড়ে ডিউটি আসতেন। ইউনিয়নের যত প্রোগ্রাম থাকত সবটাতেই উনি হাজির। ক্রেবস কোম্পানিতে সে সময় স্টাফ, পার্মানেন্ট ও ঠিকা শ্রমিক মিলিয়ে একশ'র কিছু কম লোক কাজ করত। ফেব্রিকেশন জব।

আমরা যে সংগঠনের কাজে গার্ডেনরীচ ফতেপুর অঞ্চলে সপরিবারে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতাম হিন্দুস্তান লিভার, কার্ডবোর্ড, পোদ্দার প্রজেক্ট ইত্যাদির সঙ্গে গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্সের মতো বড়ো কারখানার ইউনিয়নও তখন সেই সংগঠনের হাতে। ক্রেবসের ইউনিয়নটা একটু পরের দিকেই এল। জিতেন তখন থেকেই ওই ইউনিয়নের কাজে সহকারী হিসেবে যুক্ত হয়। ক্রেবসের শ্রমিকদের মধ্যে হাতে গোনা যে কয়েকজন ইউনিয়নের কাজে সক্রিয় হয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন চ্যাটার্জিদা। সেই সূত্রেই আমাদের বাঁধাবটতলার বাড়িতে ওঁর আসা যাওয়া ছিল। একটু চুপচাপ প্রকৃতির লোক, কথাবার্তা কম বলেন। সাধারণত সকালের দিকে কারখানা থেকে গেটপাস নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়িতে জিতেনের কাছে। কখনও একা, কখনও বা সঙ্গে থাকত বর্মা আর শম্ভু। বর্মা মানে ব্রহ্মানন্দ। ওরা তখন ছিল কন্ট্রাক্ট লেবার। বর্মা তো এসেই হৈচৈ করে গল্প জুড়ে দিত। আমাদের ছেলে তখন বেশ ছোটো। ওর সঙ্গে বর্মার খুব ভাব ছিল। আর চ্যাটার্জিদাও খুব স্নেহপ্রবণ মানুষ। মাঝে মাঝে একটা ছোটো মিষ্টির প্যাকেট এনে চুপচাপ টেবিলে রেখে দিতেন। আমি বকাবকি করলে বলতেন, বাবুর জন্য এনেছি, আজ তো পয়লা বৈশাখ। কখনও পয়লা বৈশাখ, কখনও ওঁর ছেলে বা মেয়ের ভালো রেজাল্ট — অজুহাতের অভাব হত না। আমার তখন ইভনিং অফিস, বেহালায়। ফেরার পথে রাত আটটা-নটার সময় তারাতলা মোড়ে মাঝেমাঝেই চ্যাটার্জিদার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। উনিও বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন, মেয়েকে গানের ক্লাস থেকে ফেরৎ নিয়ে আসছেন। ওঁর এক মেয়ে, এক ছেলে। পড়াশোনায় দুজনেই বেশ ভালো। কারখানার কাজ, ইউনিয়নের কাজ সামলেও ছেলেমেয়ের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে যে ওঁর নিজের একটা নজর আছে তা বুঝতাম।

চ্যাটার্জিদা সম্বন্ধে এই সময় আর একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিলাম। উনি ওঁর স্ত্রীকে বেশ সমঝে চলতেন। কোনও কাগজপত্র-লিফলেট বা পত্রিকা দিলে উনি কখনও সেটা বাড়ি নিয়ে যেতেন না। ওঁর স্ত্রী নাকি বাড়ি ফেরার পর স্নান না করলে ঘরে ঢুকতে দেন না। ছেলেমেয়েদের বইখাতা আর স্বামীর পকেটের টাকাপয়সা ছাড়া আর কিছুই রেহাই পেত না। একধরনের শুচিবাই আর কি। ইউনিয়নের কাজকর্ম করাটা ওঁর স্ত্রীর একদম না-পসন্দ ছিল।

এইভাবেই কিছুদিন কেটে যায়। যেসব কারণে জিতেন ও আমায় সেই সংগঠন ছাড়তে হয় ১৯৯৭ সালে, তার অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা। বড়ো কারখানার ইউনিয়নের দিকে বেশি নজর ও সময় দিতে গিয়ে ছোটো কারখানার ইউনিয়নের প্রতি অবহেলা। সেখানকার শ্রমিকদের প্রতি ব্যবহারেও সেটা প্রকাশ পেত। আমি সংগঠন ছাড়ার কিছুদিন আগেই ক্রেবস ইউনিয়নের সেক্রেটারি প্রফুল্ল নস্কর এবং চ্যাটার্জিদা সাসপেন্ড হয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে মোহনরামও। এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যানেজমেন্টের কাছে মুচলেকা দিয়ে প্রফুল্ল নস্কর জয়েন করলেন। উনি আমতলার দিকে গ্রামের বাড়ি থেকে যাতায়াত করতেন। বাড়িতে জমিজমা চাষবাস ছিল। তবুও ধাক্কাটা সামলাতে পারলেন না। আর চ্যাটার্জিদা শ্রমিক হিসেবে নিজের নীতি ও আদর্শে অবিচল থাকলেন মাথাটা উঁচু করে।

বছর দুয়েক পরে একদিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে চ্যাটার্জিদার সঙ্গে দেখা ফতেপুরে। একা একা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখটা খুব শুকনো, একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কথা বলে জানতে পারলাম শম্পা-মির্জানগরের ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁর স্ত্রী সব মালপত্র নিয়ে বাপের বাড়ি দমদমের দিকে চলে গেছেন। মেয়েটা মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছিল। ছেলেটা তখনও স্কুলে। পর্ণশ্রীতে মাসির বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। চ্যাটার্জিদা সাসপেন্ড হওয়ার কয়েকমাস পরে ছাঁটাই হয়ে যান। তবু ইউনিয়নের লড়াইটা ছাড়েননি। উনি এলাকায় থেকে কেসটা নিয়ে লড়তে চাইছিলেন। স্ত্রীর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। তাই তিনি ভেতরে ভেতরে ওই ঘরটা অন্য একজনকে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। যে সাইকেলটা চড়ে চ্যাটার্জিদা যাতায়াত করতেন, সেটা ছিল ওঁর পর্ণশ্রীর ভায়রাভাইয়ের (স্ত্রীর জামাইবাবু)। সেই সাইকেলটাও তাঁকে ফেরৎ দিতে হয়েছে।

কারখানা থেকে, পরিবার থেকে বিতাড়িত চ্যাটার্জিদাকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে এখন আছেন কোথায়? চলছে কীভাবে? ক্লিষ্ট মুখে একটু হেসে বললেন, ফতেপুরে বর্মার ঘরে থাকতে দিয়েছে। আর কাউকে খাওয়ানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর নিজেরই ভীষণ অভাব, সামান্য মাইনে, তাও ঠিকমতো পায় না। দেশে পরিবার আছে, সেখানে টাকা পাঠাতে হয়। তাই চ্যাটার্জিদার প্রায় না খেয়েই চলছে। ফ্যাকট্রি গেটে গেলে কখনও কোন শ্রমিক ৫-১০ টাকা দিল, পথেঘাটে অন্য কারখানার চেনা শ্রমিকেরা কেউ ডেকে একটু চা-বিস্কুট খাওয়ালো, কেউ বা হোটেলে একবেলা খাইয়ে দিল। নিজে থেকে যে যা করে। উনি তো মুখ ফুটে চাইবার লোক নন। বাকিটা জল খেয়েই কাটে। জিআরএসই বা হিন্দুস্তান লিভারের চেনা কমরেডরা কেউ কখনও কিছু খাওয়ালো, কেউ বা রাস্তার ওপার দিয়ে চলে গেল, চিনতেই পারল না।

সংগঠন ছাড়ার পর ওই এলাকায় থাকলেও আমরা নিজে থেকে কোন শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না। তবে কেউ কথা বললে মুখ ফিরিয়ে চলেও যেতাম না। চ্যাটার্জিদার অবস্থা দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হল। এমনিতেই উনি ব্লাড সুগারের রোগী, পায়ে একজিমা আছে। ক্রমাগত অর্ধাহার-অনাহার, মানসিক টানাপোড়েন। জানলাম যে সংগঠন থেকেও ওঁর নির্দিষ্টভাবে কিছু দেখাশোনা করা হচ্ছে না। নেতার সঙ্গে দেখা হলে দশ-বিশ টাকা ধরিয়ে দেন, কখনও বা কথাই বলেন না। তাঁর বাড়িতে গেলে কোন কোন সময় ঘরের ভেতর থেকে বলে পাঠান যে তিনি বাড়িতে নেই।

আমি সেদিন জোর করে ওঁকে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেলাম। বললাম, 'আমরা তিন-চারবেলা খাব, আর আপনি না খেয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াবেন, এটা তো সহ্য হবে না। দিনেরবেলা আমি থাকি না, অন্তত রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন।' জিতেনেরও ওঁর হাল দেখে চোখে জল। একটা বন্দোবস্ত হল, যতদিন না উনি অন্য কোনও কাজ জোটাতে পারছেন কিংবা সংগঠন থেকে কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ততদিন রাতে আমাদের বাড়িতে খাবেন। উনি একটু কিন্তু কিন্তু করে রাজি হলেন। কিছুদিন চলেছিল ব্যবস্থাটা। তারপর রামনগরের একটা ফুটের হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সংগঠন থেকে। তবে কোনদিন মাছ বা ডিম খেলে নেতার বকুনি শুনতে হয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যে উনি একটা কন্ট্রাক্ট সিকিউরিটির কাজ পেলেন। তার জন্য ড্রেসের টাকা বোধহয় সংগঠন থেকে দিয়েছিল আর জুতোটা আমাদের থেকে ব্যবস্থা হয়েছিল। বারো ঘন্টা ডিউটি। পায়ের ঘায়ের জন্য প্রায়ই ভোগেন, মাঝেমধ্যে ওষুধ জোগাড় করে দিতাম। সবসময় আর যোগাযোগ হত না।

চ্যাটার্জিদার কথা : ওঁর নিজের বয়ানে

আমার জন্ম হয়েছিল কোলাঘাটের গোপালনগর গ্রামে, ১৯৫০ সালে। বাবার নাম ছিল বিভূতিভূষণ চ্যাটার্জি, মা তারারাণী চ্যাটার্জি। বাবা মিলিটারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে আর কিছু করলেন না, জমিজায়গা বিক্রি করে ঘরে বসে খাচ্ছিলেন। আমরা ছিলাম পাঁচভাই, তিনবোন। দিদিরা সবাই আমার চেয়ে বড়ো। ভাইদের মধ্যে আমি মেজো। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেল। সব জমি বিক্রি হয়ে শুধু ভিটেটুকু রইল। তারপর যখন আর সামলাতে পারলেন না, বাবা আমাদের নিয়ে চলে এলেন আমাদের মামাবাড়িতে, কালিঘাটে। ৭নং কালিঘাট রোডে আমার মায়ের সাতভাই থাকতেন। ওখানে এসে বাবা পুরোহিতের কাজ নিলেন। আমার তখন পাঁচবছর বয়স। দাদা থেকে গেল দেশের বাড়িতে, কাকাদের কাছে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ও কলকাতায় চলে আসে। আমি পড়তাম নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে ধর্মদাস কর্পোরেশন স্কুলে। আমার জামাইবাবু বিনয়ভূষণ ব্যানার্জি ছিলেন কালিঘাটের নামকরা পুরোহিত। ওঁর মাধ্যমেই বাবা পুরোহিতের লাইনে ঢোকেন। ইস্কুলে ফোর পর্যন্ত পড়ে আমাকে শেষ করতে হল। কালিঘাট থেকে বাবা ঘর ভাড়া নিলেন সাহাপুর পেট্রল পাম্পের ওখানে। মন্দিরে ঘুরে ঘুরে উপায় করে ঘরভাড়া ঠিকমতো দিতে পারতেন না। তারপর বাবা যখন একজন স্ট্যান্ডার্ড পুরোহিত হলেন, শ্রাদ্ধ বিয়ে সবেরই কাজ করতেন, তখন তিনি ঘর ভাড়া নিলেন কালিঘাটের হালদারপাড়া রোডে। আমার তখন দশ-এগারো বছর বয়স। পড়াশোনা ছেড়ে আমি গিয়ে লাগলাম একটা গেটগ্রিল কোম্পানিতে। সেখানেই কয়েক বছরে ওয়েল্ডিংয়ের কাজটা শিখে নিলাম। তারপর বয়লার টেস্ট দিয়ে সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম। তখনকার বাজারে ওই পরীক্ষা দিতে ১৮০০ টাকা খরচা হয়েছিল। ওখানেই একজন আমাকে ডেকে বললেন, চ্যাটার্জি আমি একটা কোম্পানিতে জয়েন করছি, তোমাকেও নিয়ে যাব। পরের মাসে উনি জয়েন করলেন ক্রেবসে। আমাকেও নিয়ে গেলেন।

সেটা ১৯৭৫ সাল। ক্রেবসের তখন রমরমা অবস্থা। ওরা বড়ো বড়ো ট্যাঙ্ক তৈরি করত, পেপার মিলের একটা প্লেট তৈরি করত।

ফ্যাকট্রির অশোক চ্যাটার্জির মাধ্যমে দেখাশোনা করে আমার বিয়ে হয়েছিল, ১৯৭৯ সালে। বউ ম্যাট্রিক পাশ। ওঁর বাবা ছিলেন না, কাকাই অভিভাবক। তাঁরা আমার চেহারা-চরিত্র-চাকরি এইসব দেখে বিয়ে দিলেন। বিয়ের ছ'আটমাস পরে ঘর নিলাম শম্পা মির্জানগরে। কারণ কালিঘাটে একই ঘরে খাওয়াদাওয়া, ছ'আটজন থাকা, খুবই অসুবিধা।

১৯৮০ সালের পর কোম্পানিতে আইএনটিইউসি ইউনিয়ন তৈরি হল। স্টোরে কাজ করত ভিক্টর পল, ও সৌগত রায়কে নিয়ে এল। কয়েকবছর পরে মালিকের সঙ্গে কী পরামর্শ করল ওরা, ফ্যাকট্রি বন্ধ করে দিল। তখন ১৯৮৫ সাল। আমার মেয়েটার দু'বছর বয়স, ছেলেটা সদ্য হয়েছে।

আমি ওয়েল্ডিংয়ের কাজ জানতাম। তখন কন্ট্রাক্টে কাজ করতাম, ব্রেথওয়েটে। মোহনরাম এবং আরও অনেকেই গিয়েছিল। তখন ওখানে কন্ট্রাক্টে রোজ ছিল ৪০ টাকা। তখনকার বাজারে মোটামুটি চলে গিয়েছিল। এগারোমাস লকআউট চলেছিল। ভিক্টর পল ঘুষ খেয়ে এগ্রিমেন্ট করে নিল কোম্পানির সঙ্গে। সেক্রেটারি ছিল মুখার্জি। ও সই করতে চাইছিল না। ওকে লেবার দপ্তরে নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে চাপ দিয়ে সই করালো। আছোলা বাঁশ নেওয়া হল। ভিক্টর পল ১ লাখ টাকা ঘুষ খেয়ে বোনের বিয়ে দিল। পরদিন কারখানায় এসে দেখল, ওয়ার্কাররা মারবে বলে রেডি। ও কোনরকমে স্টোর থেকে বেরিয়ে ম্যানেজমেন্টের ঘরে গিয়ে রিজাইন দিয়ে পালিয়ে গেল। আইএনটিইউসি ভেঙে দেওয়া হল।

তারপর ১৯৮৬-৮৭ নাগাদ সমীর কর্মকার সিটুকে নিয়ে এল। জিইসি-র সি ঘোষ আমাদের কোয়ার্টারে থাকতেন, তাঁকে লিডার করা হল। তিনি এসে ভাষণ দিলেন — 'তোমরা এরকম আন্দোলন করছ? এশিয়াতেই কোন কাজ নেই'। আমি সমীর কর্মকারকে বললাম, 'এশিয়াতে কাজ নেই তো বার্ন-ব্রেথওয়েট চলছে কী করে এসব?' ও বলল, 'চ্যাটার্জিদা, তুমি বেশি কথা বোলো না। উনি একজন নেতা, উনি জানেন।' তখন ব্রেথওয়েটের রমরমা বাজার। আর আমাদের? আজ কাজ আছে, কাল নেই। এভাবে কিছুদিন চলল। তারপর একটা বড়ো কাজ এসে যাওয়ায় বছর পাঁচেক মোটামুটি চলল। তখন দাবিদাওয়ার কথা উঠল। কে কে ঝা বলল এক নতুন সংগ্রামী নেতার কথা। একদিন গেটের বাইরে সবাইকে ডেকে নিয়ে মিটিং করে বলল, 'এখানে ফতেপুরে কমল তেওয়ারি নামে একজন লিডার আছে, সাচ্চা লোক।' আমরা বললাম, ভালো, তাহলে চলো তার কাছে। সেটা ১৯৯৫ সাল। আইএনটিইউসি গেল, সিটু গেল, এবার হল নতুন সংগ্রামী ইউনিয়ন। এই নেতাকে আনার ছ'মাসের মধ্যে এগ্রিমেন্ট হল — ১৯৮৫ থেকে পয়সার অভাব দেখিয়ে কোম্পানি যে ডিএ-টা বন্ধ করেছিল, সেটা আবার চালু হল। বছর কয়েক ভালোই চলল। তারপর আবার নতুন চার্টার অফ ডিমান্ড নিয়ে আন্দোলন শুরু হল। স্লো ডাউন। এইসময় আমরা সাসপেন্ড হয়ে গেলাম।

সবাই ইউনিয়নের কাজে ফাঁকি মারত। বাইরে মিটিং ডাকলেই পালাত। নেতার কাছে ফাইল নিয়ে যেতে হবে, ইউনিয়নের কাজ, পার্টির কাজ, ঐ সেই চ্যাটার্জি। আর দু'একজন একটু থাকত, হরি ছিল। আমি ম্যানেজমেন্টের কাছে টার্গেট হয়ে গেলাম। বাড়িতেও খুব অশান্তি হত। বউ বলল,

— তুমি কেন পার্টিতে অ্যাক্টিভ হতে গেলে?

— শ্রমিকদের ভালোবাসি। আমি শ্রমিক, এটা শ্রমিকদের সংগঠন। এতে অন্যায়ের কী আছে?

— শ্রমিকরা তোমায় দেখবে?

১৯৯৭ সালের মার্চে আমি সাসপেন্ড হলাম। প্রথমে প্রফুল্ল নস্কর, তারপর আমি, পরে মোহনরাম। কেউ প্রতিবাদ করল না। নেতার কাছে যাওয়া হল। তিনি বললেন, 'তোমরা গেটে জড়ো হও; গেটমিটিং করো নিজেরা। বড়ো কিছু হলে আমি যাব।' তখন তিনি গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স নিয়ে পড়েছেন, পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার নিয়ে ব্যস্ত। ছ'মাসের মধ্যে আমি ছাঁটাই হয়ে গেলাম। আমার সাসপেনশন অ্যালাউন্স বন্ধ হয়ে গেল।

আগে যখন কোম্পানিতে লকআউট ছিল, ডি এন সিংয়ের সুপারিশে কিছুদিন জেসপ এবং ব্রেথওয়েটে কন্ট্রাক্টে কাজ করেছি। এখন ক্রেবস কোম্পানিতে আমার ওয়েল্ডিংয়ের সার্টিফিকেট জমা নিয়ে রেখেছে, ফেরৎ দেয়নি। আর কোথাও এরকম কাজও পেলাম না। শুরু হল কন্ট্রাক্টে সিকিউরিটির কাজ। নানা সময়, নানা জায়গায়। কোথাও একটানা বেশিদিন নয়। যাদবপুর-বাঘা যতীন অঞ্চলে মাস চারেক করেছি, ১২০০ টাকায়। ওদের কন্ট্রাক্ট উঠে যায়, তখন কাজটা চলে যায়। ১৯৯৮ সালের শেষদিকে আবার সিকিউরিটিতে জয়েন করলাম পার্ক সার্কাসে। দিনে ১২ ঘন্টা ডিউটি, নো ওয়ার্ক নো পে, নো উইকলি ছুটি। মাসে ১২০০ টাকা।

১৯৯৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর শম্পা-মির্জানগরের কোয়ার্টারটা ৬৩ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে বউ সব মালপত্র নিয়ে চলে গেল। এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও আমার আর কোন যোগাযোগ থাকল না। ছেলেকে দেখতে যখন খুব ইচ্ছে করে, হেঁটে হেঁটে পর্ণশ্রীতে ওর স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কাছে পয়সা থাকলে ওর হাতে কিছু দিই। ... ছেলে ২০০১ সালে স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করে। তারপর ওকে দমদমে নিয়ে যাওয়া

হয়। ওখানে উচ্চমাধ্যমিক যখন পড়ছিল, তখন থেকেই একটা দোকানে পার্টটাইম হিসাব লেখার কাজ করতে থাকে। উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হয়। বি কম-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এখন চাকরি করে। দমদমে যখন পড়ছিল, তখনও ফোনে যোগাযোগ করা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল।

পরের কথা

পরবর্তীকালে বেশ কিছুদিন বাদে বাদে চ্যাটার্জিদার সঙ্গে আমাদের হঠাৎ যোগাযোগ হত। কখনও উনি আমাদের বাড়ি চলে আসতেন, যখন কাজ থাকত না। আবার কখনও বা ডিউটির জায়গা থেকে ফোন করতেন। ফোন নম্বর জানা থাকলে আমরাও মাঝেমাঝে খোঁজ নিতাম। এরকম যোগাযোগ আজও আছে। ওঁর মুখে বিভিন্ন সময় শুনে এবং যখন যতটা যেভাবে দেখেছি তার ভিত্তিতেই ওঁর জীবনকাহিনী তুলে ধরছি।

পার্ক সার্কাসে জুডিয়া সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে ১৯৯৮ সাল থেকে প্রায় বছর চারেক কাজ করেছেন চ্যাটার্জিদা। এত কম মাইনেতে এত দূরে যাতায়াত করা যখন খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে, তখন একটা সময় তিনি ফতেপুর ছেড়ে চলে যান কাজের জায়গায়। দিনে ১২ ঘন্টা যেখানে ডিউটি পড়ত, রাতের সিকিউরিটির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে রাত্তিরটা সেখানেই শুয়ে কাটাতেন, হোটেলে খেয়ে। যখন মাঝেমাঝে কাজ থাকত না, তখন হত মুশকিল। ইতিমধ্যে ওঁর মা মারা যান, তিনি বারুইপুরে কোন এক ছেলের কাছে থাকতেন। মনে আছে, মায়ের শ্রাদ্ধের কাজে চ্যাটার্জিদা ওঁর এই কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, সন্তান হিসেবে শেষ কর্তব্য। পিতা হিসেবে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করতে পারছেন না, সেজন্য নিজে ভীষণ কষ্ট পেতেন। তার মধ্যেই যখন কাজ থাকত, ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে কিছুটা সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। কারণ ওঁর স্ত্রী চাইতেন না সন্তানদের সঙ্গে চ্যাটার্জিদার কোনরকম যোগাযোগ থাকুক। একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার কিছুদিন আগে থেকে কালিঘাটে ছোটোভাইয়ের বাড়িতে একবেলা খাওয়া খরচ দিয়ে থাকা শুরু করেছিলেন। যখন কাজ বন্ধ থাকত, খাওয়াও প্রায় বন্ধ। এই গোটা পর্যায়ে কিন্তু যখনই ট্রাইবুনালের ডেট পড়ত, সেইদিন ছুটি নিয়ে ঠিক হাজির হতেন। উকিলকে টাকাপয়সাও দিতে হত। মাঝেমাঝে সেটা দিতেন। এভাবে চলতে চলতেই ২০০৪ সালে একদিন উনি জানালেন যে কেসটা তুলে নিচ্ছেন, টাকাপয়সা যা পাবেন নিয়ে নেবেন।

এতদিনকার লড়াইটা আর টানা গেল না কেন : ওঁর বয়ানে

... তখন আমি কালিঘাটে থাকতাম। একদিন লেবার কোর্টে আমার ডেট পড়েছে। দেখি আমার সামনে দিয়ে আমাদের নেতা ট্যাক্সি করে যাচ্ছেন। এইচডিসি-র মিটিং ছিল। একইদিনে আমারও ডেট পড়েছিল। আমি বললাম, 'দাদা আপনাকে একবার যেতে হবে'। উনি বললেন, 'তুমি যাও, আমি আসছি'। কিন্তু এলেন না। আমার উকিল বলল, 'তুমি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে রফা করে নাও। মোহনরাম তুলে নিয়েছে টাকা, তুমিও নিয়ে নাও'। তারপর আমার মনে একটা ধিক্কার এসে গেল। আমার উকিল ম্যানেজমেন্টের উকিলের সঙ্গে একসঙ্গে আমাকে বোঝাচ্ছে!

আমার মনে একটা সন্দেহ হল। যখন নেতার বাড়িতে কথাটা বলতে গেলাম, তিনি বললেন, 'তুমি এখনও টাকা তোলোনি?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী বলছেন আপনি দাদা? আপনি তাহলে ইউনিয়ন ছেড়ে দিলেন?' উনি বললেন, 'সেরকমই ধরো'। আমি একদিন চায়ের দোকানে বসেছিলাম, দেখি কোম্পানির ক্যাশিয়ার পণ্ডিত যাচ্ছে নেতার বাড়ির দিকে। অনেক পেছনে পেছনে ফলো করে দেখি, নেতার বাড়ির সামনে গিয়ে একটা সাদা খামে চিঠি দিল। পরেরদিন আমি ওঁর বাড়িতে যেতেই উনি বললেন, 'বাত্তিকলে তোমার চিঠি এসেছে, যাও গিয়ে দেখো'।

১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ট্রাইবুনালে মামলা চলেছিল। যখনই কেস উঠত, আমি গিয়ে বলতেই কমলদা ডায়েরিতে লিখে নিতেন। একদিন কেবল তিনি গিয়েছিলেন, সেদিন আবার আমার উকিল যায়নি। তারপর একদিন যখন উকিলের কথাটা বলতে গেলাম, উনি বললেন, 'তুমি এখনও টাকা তোলোনি?' সেদিন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। যাকে আমি নেতা বলে মানি, সে বলছে, টাকা তোলোনি? ...

আমার বয়ান

চ্যাটার্জিদা টাকা তুলে নিচ্ছেন শুনে আমাদের মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল। কিন্তু কী প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে এতদিন এই লড়াইটা উনি চালিয়ে গেছেন তা ভেবে অবাক হই। কার ভরসায় উনি থাকবেন? ঘটনাচক্রে তখন আমি ফতেপুর অঞ্চলের ব্যাঙ্কে বদলি হয়ে এসেছিলাম। ওখানেই চ্যাটার্জিদার অ্যাকাউন্ট খুলে চেকগুলো ভাঙানোর ব্যবস্থা করি। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। ছেলে, মেয়ে এবং স্ত্রীর নামে কীভাবে টাকাটা রাখবেন, তা নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। উনি পরিবারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেননি বলে পরিবার থেকে ব্রাত্য হয়ে আছেন, এই বোধটা ওঁকে ভেতরে ভেতরে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। আমি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে, 'টাকাটা এমনভাবে রাখুন যাতে আপনার অবর্তমানে ওরা পায়। আর যতদিন আপনি বাঁচবেন, যখন কাজ করতে পারবেন না তখন অন্তত না খেয়ে বিনা আশ্রয়ে পথেঘাটে পড়ে থাকতে না হয়'। একদিন ওঁর ছেলে আমার অফিসে এসে দেখা করল। আমি ওর সাথে কথা বললাম, 'তোমরা কি বাবাকে একটুও বোঝো? কী ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই বছরগুলো ওঁর কাটছে, তা কি তোমরা জানো? তোমাদেরও খুব কঠিনভাবে লড়ে দাঁড়াতে হচ্ছে আমি মানছি। কিন্তু বাবার শেষ সম্বলটুকুও তো তোমাদের হাতেই উনি পুরোপুরি তুলে দিতে চাইছেন। এরপর তো পথেঘাটে উনি বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন — সৎকারটুকু কে করবে?' ছেলেটি আমাকে প্রণাম করে বলল, 'পিসি, আমাকে সেই আশির্বাদ করুন যাতে আমি যত শিগগির সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে আমাদের কাছে নিয়ে রাখতে পারি। এখন দিদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কিছু টাকা অন্তত এখন পেলে ভালো হয়'। একদিন চ্যাটার্জিদা ওঁর ছেলেকে নিয়ে এসে বেশ কিছু টাকা তুলে নিয়ে গেলেন। এরপর মেয়ের বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্নও করেছিলেন। কোম্পানির আরও চারপাঁচজন সহকর্মীকে ডেকেছিলেন। বিয়েবাড়িতে উনি আমাদের খুবই আপ্যায়ন করছিলেন। কিন্তু ওঁকে কনেকর্তা বলে মোটেই মনে হল না। মনে হল, উনিও একজন আমন্ত্রিত।

বর্তমানে কেমন আছেন চ্যাটার্জিদা

মেয়ের বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে চ্যাটার্জিদা কাজ করছিলেন রবীন্দ্র সরোবরের কাছে এসাও সিকিউরিটি কোম্পানিতে। প্রথম তিনচারমাস ডিউটি পড়ল গোলপার্কে, তারপর পাঠালো বিটি রোডে। মাইনে ছিল ১৮০০ টাকা। কখনও কখনও একই টাকায় ১২ ঘন্টার বদলে ১৬ ঘন্টা কাজ করিয়ে নিত। আবার অন্য কাউকে হয়তো ৮ ঘন্টায় ২০০০ টাকা দিত। এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত। বিটি রোডে ডিউটি চলাকালীন একবার খুব জ্বর হল। দু'চারদিন ওখানেই পড়েছিলেন। ছেলে ফোনে খবর পেয়ে ওদের দমদমের ঘরে নিয়ে গেল। টাকাপয়সা নিয়ে গণ্ডগোল-ঝগড়া চলতে থাকায় সেই কাজটা ছাড়তে হল। দু'তিনমাস বসে থাকার পর আবার একটা কাজ পেলেন ইএম বাইপাসের দিকে পঞ্চান্নগ্রামে। বার্নেট ওষুধ কোম্পানি কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল এসএমবি ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি কোম্পানিকে। তাদের কাছে ১২ ঘন্টা

কাজ, মাসে ২৫০০ টাকা মাইনে।

দমদমে তাঁর শ্বশুরবাড়ির কাছে শালারা একটু জায়গা দিয়েছিল, শম্পা মির্জানগরের কোয়ার্টার বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকে ওই জায়গায় একটা ছোটোখাটো ঘর করে তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় দিল্লিতে। ছেলে সারাদিন কলেজ ইত্যাদির পর সন্ধ্যায় এক আত্মীয়ের দোকানে খাতা লেখার কাজ করে নিজের খরচ সামাল দিত। রাতে প্রায়ই সেখানে থেকে যেত। অসুস্থ অবস্থায় যখন চ্যাটার্জিদাকে তাঁর ছেলে ঘরে নিয়ে গেল, বাবার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম হত। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনার সমস্যা তো ছিলই। ফলে খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম-অযত্ন — সুগার বাড়ল, প্রেশার বাড়ল। মেয়ের বাচ্চা হওয়ার ব্যাপার ছিল — তখন বেশ কিছুদিনের জন্য ওঁর স্ত্রী দিল্লিতে মেয়ের কাছে গিয়ে ছিলেন। ফিরে আসার পর আবার একসঙ্গে থাকা — রোজই খটামটি লেগে থাকত। মেয়ের বিয়েতে যে টাকা খরচ করেছেন, তার পরে ছেলের পড়ার খরচ চালাতে ওকেও বেশ কিছু টাকা তুলে দিয়েছেন। যখন কাজ থাকত না, তখন নিজের খোরাকিতেও কিছু টাকা খরচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছিল ৩৬ হাজার টাকা মতো।

ইতিমধ্যে ছেলে পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি পেয়েছে। কিন্তু সারাটা দিনই তাকে বাড়ির বাইরে কাটাতে হয় কাজের চাপে। বাইপাসে ডিউটি করার সময় একদিন চ্যাটার্জিদার একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট হয়। হঠাৎ ব্লাডপ্রেশার বেড়ে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ব্যাক করে পেছনে একটা মেশিনের বল্টুতে খুব জোরে কোমরে লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা ওঁকে ধরাধরি করে প্রথমে আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে এক্সরে করতে দেরি হবে বলায় ওরা ওঁকে ট্যাক্সি করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ইতিমধ্যে ওঁর জ্ঞান ফিরে আসে। বাড়িতে তিনচারদিন থাকার পর ওঁর স্ত্রী হাতিয়ারায় ভট্টাচার্য অর্থোপেডিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। সেখানে অপারেশন হয়। কোমরের কাছে একটা পায়ের জয়েন্ট ভেঙে যাওয়ায় সেখানে প্লেট বসানো হয়। হাঁটাচলা বেশ কিছুদিন একদম বন্ধ থাকে। সমস্ত টাকা শেষ হয়ে যায়। আত্মীয়েরা কেউ কেউ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। ছেলের নতুন চাকরি, সেও কিছুটা ব্যবস্থা করে।

এখন একটা হাফ-ক্রাচ জাতীয় লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। যতদিন না লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারছেন, আর কোথাও সিকিউরিটির কাজ পাবেন না। ওদিকে বার্নেট কোম্পানির কন্ট্রাক্টও শেষ হয়ে গেছে — সেখান থেকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ তো দূরস্থান, চিকিৎসার জন্য কোন ন্যূনতম টাকাও দেয়নি। মাইনের কিছু টাকা বকেয়া ছিল, সেটা আনতে যাওয়ার জন্য বর্মার কাছে ফতেপুরে গাড়িভাড়া চাইতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ওঁর ছেলে পর্ণশ্রীর কাছে একটু ভেতরের দিকে ফ্ল্যাট ভাড়া করে মা-বাবাকে নিয়ে চলে এসেছে। ওঁর সুবিধার জন্য বাথরুমে কমোডের ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু সারাটা দিন তো ছেলে থাকে না। ওঁরও কোন কাজ নেই। স্ত্রীর মেজাজ ঠিক থাকলে খেতে দেন, না হলে মাঝেমাঝেই রেগে গিয়ে খাওয়া বন্ধ। ছেলে মা-বাবা কাউকেই দুঃখ দিতে চায় না। আর মায়ের শুচিবায়ু বাতিক তো ছোটোবেলা থেকে মেনে চলার অভ্যেস আছে ওদের। মায়ের আপত্তি থাকায় বাবা ছেলের সঙ্গে এখনও কথা বলেন বাড়ির বাইরে, লুকিয়ে লুকিয়ে। এভাবেই ওর কাছ থেকে অল্প কিছু টাকা নিয়ে দাড়ি কেটেছেন এবং বাসের ভাড়া দিয়েছেন, শেষ যেবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

তেরো বছর আগে যিনি ছিলেন একজন সক্ষম হাসিখুশি দক্ষ শ্রমিক, আজ ওঁকে দেখলে মনে হবে একটা ভগ্নস্তূপ। একটা লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন, দিনভর ঘরে মন খারাপ করে বসে থাকেন, বিকেলের দিকে বাড়ির কাছে একটা মন্দিরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন — মানুষজন-চলমান জীবন দেখেন। আগে ওঁর একটা মোবাইল ফোন ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলে যদি খেয়াল করে সেটা সারিয়ে দেয় সেই ভরসায় আছেন। আর এখনও মনের জোর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাতে আশা রাখেন আস্তে আস্তে লাঠি ছাড়া হাঁটা সম্ভব হবে, আবার কোথাও সিকিউরিটির কাজ জোগাড় করতে পারবেন। তখন আর কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না।

উপসাগরে তেল ছলকিয়ে পড়ল —
পৃথিবীর গায়ে ফাটল

নাওমি ক্লেইন

টাউন হলের সভায় যারা এসেছিল, প্রত্যেককে বারবার বিপি (ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) ও ফেডারেল গভর্নমেন্টের ভদ্রলোকেদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হল। এই ভদ্রলোকেরা তাদের কর্মব্যস্ততার মাঝে একটু সময় নষ্ট করে হাইস্কুলের জিমনাসিয়ামে উপস্থিত হয়েছিল। দিনটা ছিল মঙ্গলবার। লুইসিয়ানার প্লেক্‌মাইনস পারিশ-এ রাতেরবেলায় ছিল এই সভা। উপকূলবর্তী বহু জনসমাজের একটি বাস করে এখানে। এখানকার জলাভূমিতে টলটলিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাদামী বিষের ধারা। এ হল আমেরিকার ইতিহাসে বৃহত্তম পরিবেশগত বিপর্যয় হিসেবে বর্ণিত ঘটনারই অংশবিশেষ।

প্রশ্ন করার পালা শুরু হওয়ার আগে সভাপতি বললেন, "আপনারা যা বলতে চান তা অন্যদের বলুন"। কিছুক্ষণ জনতা চুপ করে রইল, যতটা নিজেদের সংযত রাখা যায়। এরা বেশিরভাগই এসেছে জেলে পরিবারগুলো থেকে। এরা সবাই ধৈর্য ধরে বিপি-র অমায়িক পাবলিক রিলেশন অফিসারের কথাগুলো শুনল। তিনি বললেন, ক্ষয়ক্ষতির যে অভিযোগ এখানকার মানুষের রয়েছে সেটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে তিনি দায়বদ্ধ। এরপর তিনি আরও বিশদ আলোচনার ভার তুলে দিলেন এক সাবকন্ট্রাক্টরের ওপর — এই লোকটি অবশ্য ততটা অমায়িক নয়। পরিবেশ রক্ষা দপ্তরের কাছে এরা মামলাটা শুনেছে। এই লোকটি জানালো, টেস্টিং না হওয়া এবং ব্রিটেনে এই তেলটা নিষিদ্ধ বলে যেটা আপনারা পড়েছেন, তা ঠিক নয়। বরং তেলটার ওপরে যে রাসায়নিক ব্যাপক পরিমাণে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা সত্যিই সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কিন্তু উপকূল রক্ষীদলের এক ক্যাপটেন, এড স্টান্টন মঞ্চে উঠে সকলকে তৃতীয়দফায় আবার আশ্বস্ত করতে গেলেন যে, "বিপি উপকূল সাফ করে দিচ্ছে, উপকূল রক্ষীদল সে সম্পর্কে সকলকে নিশ্চিন্ত করতে চায়"। এবার শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করল।

একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, "সেটা লিখিত দেওয়া হোক!" ইতিমধ্যে এয়ার কন্ডিশন মেশিনটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে, কুলারগুলো আস্তে চলছে। একজন বেঁটে লোক, ওঁর নাম ম্যাট ও'ব্রিয়েন, মাইকের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি পিছনে হাত রেখে বললেন, "থাক, এসব আর আমরা শুনতে চাই না"। এদের কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ তিনি বুঝিয়ে দিলেন, "আমরা আপনাদের মোটেই বিশ্বাস করি না"। এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভা থেকে সমর্থনজ্ঞাপক এমন এক ধ্বনি উঠল যে তেলুরা (দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্কুলের ফুটবল টিমের নামও তেলু) গোল খেয়ে গেল।

আর কিছুই নয়, বোঝা গেল ব্যাপারটা হজম হয়নি। পরের কয়েক সপ্তাহ

ধরে এখানকার বাসিন্দাদের ওয়াশিংটন, হাউস্টন এবং লন্ডন থেকে তেজোদ্দীপ্ত প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হল। এরা টিভি খুললেই দেখতে পেত বিপি-র বস টনি হেওয়ার্ড-কে। তিনি গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে অভয়দান করতেন, সব কিছু তিনি "ঠিক করে দেবেন"। কিংবা দেখা যেত রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে, তিনি চূড়ান্ত এক প্রত্যয় নিয়ে বলতেন, তাঁর প্রশাসন "উপসাগরীয় উপকূলভাগকে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় নিয়ে যাবে"। যেন তিনি নিশ্চিত যে জায়গাটা "এই সংকটের আগের অবস্থার চেয়েও সজীব হয়ে উঠবে"।

কথাগুলো শুনতে বেশ! কিন্তু এই জলাভূমির সূক্ষ্ম রসায়নের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাদের জীবন কাটে, তাদের কাছে এইসব কথা বেদনাদায়কভাবেই সম্পূর্ণ হাস্যকর। একবার যখন জলার ঘাসে তেলের আস্তরণ পড়ে, যেটা এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ঘটেছে, তখন কোন অলৌকিক ক্রিয়ায় অথবা রাসায়নিক যোগসাজশে এর হাত থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। আপনি খোলা জলের ওপর থেকে তেলের সরটা আলতোভাবে তুলে নিতে পারেন; আপনি একটা বালুকাবেলা থেকে তেল চেঁছে নিতে পারেন। কিন্তু একটা তৈলাক্ত জলাভূমি ধীরগতিতে শেষ হয়ে যায়। জলাভূমি হল অসংখ্য প্রজাতির শূকের (যারা ডিম পাড়ে) ধাত্রীভূমি —— চিংড়ি, কাঁকড়া, শুক্তি, ফিনমাছ — সব বিষাক্ত হয়ে যায়।

এই বিষক্রিয়া ইতিমধ্যেই ঘটে চলেছে। এদিন আমি একটা নৌকায় চেপে কাছের এক জলায় ঘুরছিলাম। বিপি তেল শুষে নেওয়ার জন্য যে পুরু তুলো ও জাল ব্যবহার করছিল, তার সাদা আস্তরণ ভেদ করে মাছেরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, ওই নোংরা গোলাকার বস্তু মাছেদের চারপাশে একটা ফাঁসের মতো তৈরি করছিল। কাছেই একটা লাল ডানাওয়ালা কালো পাখি দু'মিটার লম্বা তেলে দূষিত এক ঘাসের ফলার ওপর উড়ে এসে বসল। ঘাসের ফলা বেয়ে চুপিসাড়ে এগিয়ে আসছিল মৃত্যু; ছোট্ট পাখিটা যেন একটা জ্বলন্ত ডিনামাইট-দণ্ডের ওপর দাঁড়িয়েছিল।

যদি ঘাসের ওই তীক্ষ্ণ ফলাগুলোর কথাই ধরা যায়, যদি ওগুলোতে যথেষ্ট তেল ঢুকে পড়ে, মাটির ওপরের ঘাসগুলোই মরবে না, শিকড়গুলোও মরবে। এইসব শিকড় ঘাসগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে, সবুজ তরতাজা তৃণভূমিকে মিসিসিপি নদীর বদ্বীপে এবং মেক্সিকো উপসাগরে মিলিয়ে যেতে দেয় না। অতএব কেবল প্লেকমাইনস পারিশ-এর মতো এলাকাগুলোয় মাছের ভেড়ি নষ্ট হচ্ছে না, একই সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেইসব প্রাকৃতিক বাধা, যা ক্যাটরিনার মতো ঝড়ের তীব্রতাকে কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ হারিয়ে যেতে চলেছে সবকিছুই।

একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের সমন্বিত যে ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে, ওবামার আভ্যন্তরীণ সচিবের ঘোষণা মতো তার "পুনরুদ্ধার ও সম্পূর্ণতা দান" কত সময়ে সম্পন্ন হবে? অদূর ভবিষ্যতেও তা সম্ভব কিনা মোটেই স্পষ্ট নয়, একটা সময়সীমার মধ্যে তো নয়ই। ১৯৮৯ সালের এক্সন ভ্যালদেজ তেল নির্গমনের ফলে আলাস্কার যে মাছের ভেড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি। ওখানকার কিছু প্রজাতির মাছ আর কখনই ফিরে আসবে না। সরকারি বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করছেন, সম্ভবত ভ্যালদেজের তেল প্রতি চারদিনে উপসাগরীয় উপকূলের জলে ঢুকে পড়ছে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের তেল নির্গমন থেকে আরও ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পাওয়া যায়। সেসময় পারস্য উপসাগরে ১১০ লক্ষ ব্যারেল তেল জমা করা হয়েছিল, ওটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো তেল নির্গমনের ঘটনা। ওই তেলটা জলাভূমিতে ঢোকে এবং সেখানে জমা হয়। কাঁকড়ার খুঁড়ে রাখা গর্তগুলো দিয়ে ওই তেল ক্রমশ মাটির আরও গভীরে প্রবেশ করে। এই ঘটনার সঙ্গে পুরোটা তুলনা করা চলে না, কিন্তু ওই বিপর্যয়ের ১২ বছর পরে করা এক সমীক্ষায় জানা যায়, ওই তেলের সংস্পর্শে আসা কর্দমাক্ত নোনা জলা ও বাদাবনের প্রায় ৯০% এখনও ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়ে রয়েছে।

আমরা এগুলো জানি। উপসাগরীয় উপকূলভাগ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশ তা আরও খারাপের দিকেই যাবে। সমৃদ্ধ জলরাশি আর আকাশ আজকের চেয়ে কম জীবন্ত থাকবে। মানচিত্রের যে বাস্তুভূমি আজ বহু জনসমাজের আবাস, তাও সংকুচিত হবে, ভাঙনকে দায়ী করা হবে। উপকূলের লোকসংস্কৃতি বিলুপ্ত হবে। উপকূলের ওপর ও নিচের মৎস্যজীবী পরিবারগুলি তো কেবল খাদ্য সংগ্রহই করে না। তারা পরিবারের ঐতিহ্য, রন্ধনকলা, সংগীত, শিল্পকলা এবং বিপন্ন ভাষাগুলিকে নিয়ে একটা বিজড়িত সংযোগ রক্ষা করে — অনেকটা জলার ঘাসের শিকড়ের মতো। মাছ ধরা না থাকলে এই অদ্বিতীয় সংস্কৃতিগুলো হারিয়ে ফেলবে তাদের শিকড়, যে ভিত্তির ওপর তারা দাঁড়িয়ে আছে সেটাই সরে যাবে। (বিপি তার দিক থেকে পুনরুদ্ধারের সীমাবদ্ধতাটা ভালোই জানে। কোম্পানির মেক্সিকো উপসাগরের আঞ্চলিক তেল নির্গমন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় আধিকারিকদের নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "সম্পদ, পরিবেশ, অথবা অন্য কিছু আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি" যেন না করা হয়। সেই কারণেই এদের আধিকারিকরা "ঠিকঠাক করে দেওয়া" গোছের কথা অটলভাবে বলে চলে।)

যদি ক্যাটরিনা আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের বাস্তবতার পর্দাটা সরিয়ে ফেলে থাকে, বিপি-র এই বিপর্যয় আরও লুক্কায়িত কিছুর পর্দা সরিয়ে দিয়েছে : ভয়ঙ্কর জটিলভাবে সংযুক্ত প্রাকৃতিক শক্তির ওপর আমাদের মধ্যে দক্ষতম ব্যক্তিরও কত সামান্য নিয়ন্ত্রণ, কত সহজভাবে আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাই, বিপি পৃথিবীর বুকে যে ছিদ্র তৈরি করেছে, তাকে বুজিয়ে দিতে অপারগ। ওবামা নির্দেশ দিলেই মৎস্য প্রজাতিরা টিকে থাকবে না, কিংবা বাদামী পেলিকানরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবে না। কোন টাকার পরিমাণ দিয়ে — বিপি-র সাম্প্রতিক ঘোষিত ১০০ বিলিয়ন ডলার নয়, ২০ বিলিয়ন ডলার দিয়ে — যে সংস্কৃতি তার শিকড় হারিয়েছে তা পুনঃস্থাপিত হবে না। এই বিনম্র সত্যকে আত্মস্থ করতে আমাদের রাজনীতিবিদ ও কর্পোরেট নেতাদের সময় লাগতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ — যাদের বাতাস, জল আর জীবিকা দূষিত হয়ে গেছে — দ্রুতই মোহমুক্ত হচ্ছে।

টাউন হলের সভায় শেষের দিকে এক মহিলা বলেন, "সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ... কী করে তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলবে যে আমাদের এই উপসাগর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে? কারণ তোমরা তো কেউই এতটুকু জানো না যে কী ঘটে চলেছে উপসাগরের ভিতর। তোমরা সোজা তাকিয়ে বসে আছো আর তোমাদের জ্ঞানগম্যি অনুযায়ী যা হয় কিছু করে চলেছো। অথচ তোমরা তো কিছুই জানো না।"

অনেক কিছু নিয়েই উপসাগরীয় উপকূলের সংকট — দুর্নীতি, অনিয়ন্ত্রণ, জীবাশ্ম-জ্বালানির নেশা। কিন্তু এসবের অন্তরালে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির যন্ত্রণাদায়কভাবে বিপজ্জনক এক দাবি : প্রকৃতি সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের রয়েছে; যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, আমরা সামান্য ঝুঁকি নিয়ে তার আমূল রদবদল ঘটাতে পারি। কিন্তু বিপি-র বিপর্যয় দেখিয়ে দিল, সবচেয়ে কৃত্রিম গণিত ও ভূবিদ্যার যে মডেলগুলি আমরা কল্পনা করতে পারি, প্রকৃতি সর্বদা তার চেয়েও অকল্পনীয়। বৃহস্পতিবারের সাক্ষ্য চলাকালীন হেওয়ার্ড বলেন, "সর্বোত্তম মস্তিষ্ক আর গভীরতম বিশেষজ্ঞতাকে আনা হচ্ছে" এই সংকট মোকাবিলার জন্য এবং তা "১৯৬০-এর দশকের স্পেস প্রোগ্রামের মতো সম্ভাব্য ব্যতিক্রম নিয়ে। শান্তির সময়ে এর চেয়ে বড়ো আর প্রযুক্তিগত কুশলী লোকেদের এক জায়গায় জড়ো করা কঠিন।" যদিও ভূতাত্ত্বিক জিল স্নাইডারম্যান এই অবস্থাটাকে "প্যান্ডোরা'জ ওয়েল" বা আশার ভাণ্ডার বলে বর্ণনা করেছেন, ওই

জিমনাসিয়ামের সম্মুখ সারির সেরা লোকেরা যা জানে তাই প্রয়োগ করে। কিন্তু তারা জানে না।

বিপি-র উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিবৃতি

প্রকৃতি আমাদের কাছে একটা যন্ত্র বিশেষ, যাকে আমরা ইচ্ছে মতো পরিচালনা করতে পারি —— এই ধারণা মানব ইতিহাসের পরিধিতে এক সাম্প্রতিক আত্মগর্ব। পরিবেশ-ইতিহাসবিদ ক্যারোলিন মার্চেন্ট তাঁর ১৯৮০ সালের বই, "প্রকৃতির মৃত্যু"-তে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ষোড়শ শতক অবধি পৃথিবী ছিল জীবন্ত, সে এক মায়ের রূপ নিয়ে থাকত। ইউরোপীয়রা —— সারা বিশ্বের আদিবাসিন্দাদের মতোই —— এই গ্রহকে এক জীবন্ত বস্তু হিসেবে বিশ্বাস করত; তারা মনে করত, গ্রহের এক জীবনদায়ী ক্ষমতা রয়েছে, আবার ক্রোধও রয়েছে। সেই কারণে, সেই যুগে খনিজ পদার্থ উত্তোলন সহ 'মা'-কে বিকৃত এবং অপবিত্র করার বিরুদ্ধে গভীর সংস্কার ছিল।

ষোড়শ শতকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সময় প্রকৃতির কিছু রহস্য (মোটেই সব নয়) উদ্‌ঘাটনের ফলে রূপকটা পাল্টে গেল। প্রকৃতি এখন রহস্য বা স্বর্গীয় রূপ ছেড়ে একটা যন্ত্রের ভূমিকা নেওয়ায় তার শরীরের অংশগুলিকে যথেচ্ছভাবে দমন করা, নিষ্পেষণ করা এবং বদলে ফেলা সম্ভব হল। তাসত্ত্বেও প্রকৃতি কখনও কখনও নারী রূপে হাজির হত, কিন্তু তাকে সহজেই দাবিয়ে রাখা যেত। স্যর ফ্রান্সিস বেকন ১৬২৩ সালে *De dignitate et augmentis scientiarum*-এ নতুন যুগের বৈশিষ্ট্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরেছিলেন, প্রকৃতিকে "এমনভাবে বেঁধে, ঢালাই করে তৈরি করে নিতে হবে যাতে তা শিল্পকলা এবং মানুষের হাতে নতুন হয়ে ওঠে"।

এই শব্দগুলো বিপি-র কর্পোরেট উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিবৃতি হতে পারত। জোরালো ভাষায় কোম্পানি তাকে "শক্তি সীমান্ত" বলে অধিকার করল, মিথেন সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংশ্লেষ নিয়ে চর্চা করল এবং ঘোষণা করল যে "অনুসন্ধানের এক নতুন এলাকা" তৈরি হতে চলেছে। এবং অবশ্যই সদম্ভে ঘোষণা করল যে, তাদের মেক্সিকো উপসাগরের টিবার প্রস্পেক্টে "তেল ও গ্যাস শিল্পের দ্বারা এতাবৎকালের সবচেয়ে গভীর কূপ খনন" করা হয়েছে — তা এতটাই গভীর যে মাথার ওপরে জেটবিমানের মতো সমুদ্রের তলায় উড়ে যাওয়া যায়।

যদি জীবন ও ভূবিদ্যার ইমারত বদলের এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভুলপথে চলে যায়, তাহলে কী ঘটতে পারে সেটার কল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য মূল্যবান কর্পোরেট ভাবনায় একফোঁটা জায়গাও রাখা হয়নি। আমরা সকলেই আবিষ্কার করলাম, ২০ এপ্রিল যখন ডিপওয়াটার হরাইজনের সাজসজ্জা বিস্ফোরিত হল, কোম্পানির কাছে সেই অবস্থা সামাল দেওয়ার মতো কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কেন চূড়ান্ত অকেজো হয়ে যাওয়া প্রাচীরকে সারিয়ে ফেলা গেল না, তা ব্যাখ্যা করে বিপি-র মুখপাত্র স্টিভ রাইনহার্ট বলেন, "এখন যে অবস্থাটা আমরা মোকাবিলা করছি, আমার মনে হয় কেউই তা আগে ভাবতে পারেনি।" ব্লোআউট প্রিভেন্টার যে অকেজো হয়ে যেতে পারে, এটা "মনে হয় অকল্পনীয়"। তাহলে কেন প্রস্তুত হব?

বিপর্যয়কে মনোযোগ সহকারে বিচার না করে দেখার মনোভাব সরাসরি ওপর থেকেই আসছে। এক বছর আগে হেওয়ার্ড স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির একদল গ্রাজুয়েট ছাত্রকে বলেছিলেন, তাঁর ডেস্কের ওপর একটা ফলকে লেখা রয়েছে : "যদি তুমি জান যে তুমি ব্যর্থ হবে না, তাহলে তুমি কী চেষ্টা করবে?" এটা মোটেই কোন বিনয়ী প্রেরণাদায়ী শ্লোগান নয়। আসলে এটা হল একেবারে নিখুঁত এক বর্ণনা, কীভাবে বিপি এবং তার প্রতিযোগীরা বাস্তব দুনিয়ায় চলে। ক্যাপিটল হিলের সাম্প্রতিক শুনানিতে ম্যাসাচুসেটসের কংগ্রেসম্যান এড মার্কি সবচেয়ে বড়ো তেল ও গ্যাস কোম্পানি থেকে আসা প্রতিনিধিদের অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলেন, কীভাবে তাদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। তিন বছরের ওপর, তারা খরচ করেছে "নতুন তেল ও গ্যাস খুঁজে নেওয়ার জন্য ৩৯ বিলিয়ন ডলার। যদিও নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা রোধ এবং হঠাৎ তেল নির্গমন করলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বছরে গড় বিনিয়োগ নামমাত্র ২০ মিলিয়ন ডলার।"

এই অগ্রাধিকারের ধরন থেকেই বোঝা যায়, কেন বিপি দুর্ভাগ্যজনক ডিপওয়াটার হরাইজন কূপের জন্য যে পরীক্ষা-পরিকল্পনা ফেডারেল সরকারকে জমা দিয়েছিল, তা পড়তে মানবিক ঔদ্ধত্য প্রসূত গ্রিক ট্রাজেডির মতো লাগে। "সামান্য ঝুঁকি" কথাটা পাঁচবার ব্যবহার করা হয়েছে। যদি তেল বেরিয়ে আসে, বিপি দৃঢ়তার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করে, যাক "পরীক্ষিত যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তি" তো রয়েছে। মন্দ কিছু সামান্যই ঘটবে। প্রকৃতিকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আন্দাজ করতে সক্ষম এবং সম্মত এক জুনিয়র পার্টনার (কিংবা সাবকন্ট্রাক্টর) হিসেবে দেখে বিপি-র রিপোর্টে খুশ মেজাজে ব্যাখ্যা করা হয়, যদি তেল বেরিয়েও আসে, "জলস্রোত এবং জীবাণুর ক্ষয় তেলকে জল থেকে আলাদা করে দেবে অথবা তার উপাদানগুলিকে পিছনে ঠেলে দেবে"। মাছেদের ওপর প্রভাব তেমন মারাত্মক হবে না, কারণ "বড়ো মাছ ও শেলফিশ নির্গত তেলকে এড়িয়ে যেতে পারে এবং হাইড্রোকার্বন পরিপাক করে না"। (বিপি-র বক্তব্য অনুযায়ী, এক ভয়াবহ বিপদ নয়, বরং জলজ জীবনের জন্য নির্গত তেল হল এমন এক খাবারের টেবিল যেখান থেকে নিজের ইচ্ছে মতো বেছে খাওয়া যায়।)

যদি বড়ো আকারে তেল নির্গত হয়, সব ঠিকঠাক থাকলে আপাতভাবে "উপকূলরেখায় কোন সংস্পর্শ বা প্রভাবের ঝুঁকি নেই", কারণ কোম্পানির বক্তব্য অনুযায়ী দ্রুত হস্তক্ষেপ (!) এবং "রিগ থেকে তীরের দূরত্ব" — প্রায় ৭৭ কিমি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল এই দাবি! যে উপসাগরে প্রায়শই ঘন্টায় ৭০ কিমি বেগে হাওয়া বয়, সেখানে ভাবা যাচ্ছে না যে তেল ৭৭ কিমি পথ পাড়ি দেবে, সেটা তো খুব সামান্যই। (গত সপ্তাহে বিস্ফোরিত ডিপওয়াটার হরাইজনের একটা ভাঙা টুকরো ৩০৬ কিমি দূরে ফ্লোরিডার বিচে দেখা গেছে।)

এই ধরনের জোলো কথাবার্তা সম্ভব হত না, যদি না বিপি তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এমন এক রাজনৈতিক শ্রেণীর কাছে পেশ করত, যারা প্রকৃতিকে অবশ্যই বশ করা যায় বলে বিশ্বাস করতে আগ্রহী। কয়েকজন, যেমন রিপাবলিকান লিসা মারকৌস্কি, অন্যদের চেয়ে বেশি আগ্রহী। আলাস্কার এই সেনেটর ইন্ডাস্ট্রির চার-মাত্রিক ভূকম্পন-প্রতিচ্ছবির দ্বারা এত ভয়াবহভাবে নাড়া খেয়েছেন, তিনি দাবি করে বসলেন যে গভীর সমুদ্রে ড্রিলিং নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিমতার চরম উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। মাত্র সাতমাস আগে তিনি সেনেট এনার্জি কমিটিকে বলেছেন, "এটা ডিজনিল্যান্ডের চেয়ে ভালো যেভাবে আপনারা প্রযুক্তিকে নিয়েছেন এবং একটা হাজার হাজার বছরের পুরনো সম্পদের জন্য চেষ্টা করছেন পরিবেশগত কোন ফাঁক না রেখেই।"

চিন্তাভাবনা না করে ড্রিলিং করা অবশ্য ২০০৮ সালের মে মাস থেকেই রিপাবলিকান পার্টির পলিসি। যখন গ্যাসের দাম অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গেল, কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নিউট গিনগ্রিচ একটা শ্লোগান উদ্ভাবন করেন, "এখানে ড্রিল করো, এখন করো, দাম কম দাও" — তাঁর জোরটা ছিল এখনের ওপর। উন্মত্ত জনপ্রিয় প্রচার ছিল সতর্কতার বিরুদ্ধে একটা আওয়াজ, কোন অনুসন্ধানের দরকার নেই, কোন পরিমাপ মতো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। গিনগ্রিচের কথায়, দেশের ভেতর যেখানে তেল ও গ্যাস পাওয়া যেতে পারে সেখানেই ড্রিলিং করা —— রকি মাউন্টেন শেলের মধ্যে, আর্কটিক ন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ রিফিউজে এবং গভীর সমুদ্রে — একমাত্র নিশ্চিত উপায়, যার মাধ্যমে পাম্পের দাম কমানো যাবে, কর্মসংস্থান হবে এবং আরবের গাধাগুলোকে একই সঙ্গে তাড়ানো যাবে। এই ত্রিমুখী জয়ের

সামনে পরিবেশের তোয়াক্কা করা মানে মেয়েলি ব্যাপার : সেনেটর মিশ ম্যাককোনেল এভাবে বলেন, "আলাবামা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা এবং টেক্সাসে ওরা মনে করে তেলের ব্যবস্থা বেশ ভালো"। ততক্ষণে অখ্যাত রিপাবলিকান জাতীয় আওয়াজ "ড্রিল বেবি ড্রিল" চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, পার্টি আমেরিকার তৈরি জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ল, যেন কেউ এক মস্ত ড্রিল এনে ফেলেছে।

ওবামা শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলেন। মহাজাগতিক মন্দ সময়ে, ডিপওয়াটার হরাইজন বিস্ফোরণের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন যে তিনি দেশের পূর্বতন সংরক্ষিত অংশগুলি অফশোর ড্রিলিংয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। তিনি আগে যেমন ভেবেছিলেন, ব্যাপারটা ততটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "তেল উত্তোলনের ফলে আজকাল সাধারণত নির্গমন ঘটে না। কাজটা প্রযুক্তিগতভাবে খুব আধুনিক।" সারাহ পালিন ব্যবস্থাটাকে যথেষ্ট মনে করতে পারলেন না। তিনি ওবামা প্রশাসনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে কয়েকটা এলাকায় ড্রিলিংয়ের আগে আরও অনুসন্ধান চালাতে বললেন। বিস্ফোরণের মাত্র ১১ দিন আগে তিনি নিউ অরলিন্সে সাদার্ন রিপাবলিকান লিডারশিপ কনফারেন্সে বললেন, "এইসব এলাকায় অনুসন্ধান করে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকছে"। সকলে আনন্দে মেতে উঠল, "লেট'স ড্রিল বেবি ড্রিল, নট স্টল বেবি স্টল!" অর্থাৎ থামার কোন প্রশ্ন নেই।

কংগ্রেসের সাক্ষ্যতে হেওয়ার্ড বলেন, "আমরা এবং গোটা ইন্ডাস্ট্রি এই ভয়ঙ্কর ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে।" এটা যে কেউ ভালোভাবেই কল্পনা করে নিতে পারে যে এই মাপের একটা বিপর্যয় বিপি-র একজিকিউটিভদের আরও শক্ত করে তুলবে এবং "এখনই ড্রিল করো" বলে যারা আওয়াজ তুলেছিল তাদের মধ্যে একটা নতুন অপমানের বোধ জাগিয়ে তুলবে। যদিও এর বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও দেখা যায়নি। বিপর্যয়ের মোকাবিলায় —— কর্পোরেট ও সরকারি স্তরে —— সেই ঔদ্ধত্য আর হাসিখুশি ভবিষ্যদ্বাণী, যার জন্যই বিপর্যয়টা ঘটেছিল।

সমুদ্র বিশাল, সে সবকিছু ধারণ করে নেবে —— প্রথমদিকে হেওয়ার্ড এরকম বলতেন। তাঁদের মুখপাত্র জন কারি জোর দিতেন, ক্ষুধার্ত জীবাণুরা জলের মধ্য থেকে তেল আহরণ করে নেবে। কারণ "প্রকৃতির মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে"। কিন্তু প্রকৃতি তো একা খেলছিল না। গভীর সমুদ্রে প্রবলভাবে নিঃসৃত পদার্থটি বিপি-র সমস্ত মুকুট ভেদ করে উপচে পড়ছিল, আবরণের গম্বুজগুলো থেকে বেরিয়ে আসছিল। সমুদ্রের বাতাস আর স্রোত বিপি-র তেল শুষে নেওয়ার পরিকল্পনাকে ব্যঙ্গ করছিল। লুইসিয়ানা শুক্তি সমিতির প্রেসিডেন্ট বায়রন এনকালেড বলেন, "আমরা ওদের বলেছিলাম যে তেলটা তুলোর টুকরো ও জালের ওপর দিয়ে কিংবা তলদেশ থেকে চলে আসবে"। সেটাই ঘটল। মেরিন বায়োলজিস্ট রিক স্টেনার সাফাই প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি হিসেব দেন, "৭০ থেকে ৮০% তুলোর টুকরো ও জাল আদৌ কোন কাজেই লাগছিল না"।

তারপর এসেছে বিতর্কিত রাসায়নিক দিয়ে তেলটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ : ১৩০ লক্ষ গ্যালন রাসায়নিক জড়ো করা হয়েছে, কোম্পানির ভঙ্গিমা হল, "কী গণ্ডগোল আর হতে পারে?" প্লেকমাইনস টাউন হলের ক্রুদ্ধ বাসিন্দারা সঠিকভাবেই বলেছিল, এব্যাপারে কোন পরীক্ষাই করা হয়নি এবং এই অভূতপূর্ব পরিমাণ ছড়িয়ে যাওয়া তেল জলজ জীবনে কী ঘটাতে পারে তা নিয়ে গবেষণা অপর্যাপ্ত। জলের নিচে তেল ও রাসায়নিকের বিষাক্ত মিশ্রণ সাফ করারও কোন উপায় নেই। হ্যাঁ, দ্রুত বংশবৃদ্ধিকারী জীবাণুরা জলের নিচের তেল খেয়ে নেয় —— কিন্তু একই প্রক্রিয়ায় তারা জলের অক্সিজেন শুষে নেয়, যা জলজ জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন এক বিপদ।

বিপি এমন কল্পনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে যে তারা তেলে ঢাকা সমুদ্রতট ও পাখিদের বিপর্যস্ত এলাকা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যখন আমি এক টেলিভিশন কর্মীর সঙ্গে জলায় গিয়েছিলাম, আমাদের পিছনে আর একটা নৌকা আসছিল। তার ক্যাপটেন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা সব বিপি-র জন্য কাজ করেন?" আমরা না বলাতে তিনি খোলা সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহলে তোমরা এখানে থাকতে পার না"। কিন্তু এইসব কড়া হাতের কৌশল অন্য সব কৌশলের মতো ব্যর্থ হয়েছে। বেশ অনেক জায়গায় অনেক বেশি তেল ছড়িয়ে রয়েছে। ডেবরা রামিরেজ বললেন, "আপনি পবনদেবকে বলতে পারেন না কোথায় হাওয়া বইবে, কোনদিকে যাবে; আর জলকেও বলতে পারেন না কোথায় বইবে, কোনদিকে যাবে।" লুইসিয়ানার মসভিল-এ বাস করে এই শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, জায়গাটাকে ঘিরে ১৪টা পেট্রোকেমিকাল প্ল্যান ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে। এই মহিলা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে ঘরে অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ছে।

এই বিপর্যয়ের একটা স্থায়ী বিষয় হল মানুষের সীমাবদ্ধতা। দু'মাস কেটে গেছে, আমরা এখনও জানি না কতটা তেল ছড়িয়ে গেছে আর কখন সেটা বন্ধ হবে। কোম্পানি দাবি করছে, আগস্টের শেষে কূপগুলো সম্পূর্ণ স্বস্তি পাবে —— কথাটা ওবামার ওভাল অফিস থেকেও পুনরুচ্চারণ করা হয়েছে —— কিন্তু বহু বিজ্ঞানী এটাকে মিথ্যা হিসেবে দেখছেন। পুরো পদ্ধতিটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যর্থ হতে পারে। এমন এক বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে যে বছরের পর বছর ধরে তেল বেরোতে থাকবে।

সত্য ঘটনাবলীকে অস্বীকার করার গতি অবশ্য প্রশমিত হচ্ছে না। লুইসিয়ানার রাজনীতিবিদেরা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে অস্থায়ীভাবে ডিপওয়াটার ড্রিলিং বন্ধ রাখার জন্য ওবামার নির্দেশকে বিরোধিতা করছে। তারা অভিযোগ করছে, মৎস্যচাষ ও পর্যটন সংকটে পড়েছে বলে একটা বড়ো ইন্ডাস্ট্রিকে হত্যা করা হচ্ছে। পালিন ফেসবুকে আলোচনা করেছেন, "কোন মানবিক উদ্যোগ কখনই ঝুঁকি ছাড়া হতে পারে না", ওদিকে টেক্সাসের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জন কালবারসন এই বিপর্যয়কে একটা "পরিসংখ্যানের অনিয়ম" বলে বর্ণনা করেছেন। ওয়াশিংটনের বহু পুরনো কমেন্টেটর লিওয়েলিন কিং সবচেয়ে মর্মান্তিক মন্তব্য করেছেন : বৃহৎ যন্ত্রবিজ্ঞানের ঝুঁকি থেকে সরে না এসে আমাদের বিস্ময়ে অপেক্ষা করে থাকা উচিত কখন "আমরা এমন অসাধারণ যন্ত্র তৈরি করতে পারব যা পৃথিবীর নিচের ঢাকনাটা খুলে দেবে"।

এই রক্তক্ষরণ বন্ধ হোক

বহু মানুষ এই বিপর্যয় থেকে একটা অন্যরকম শিক্ষা নিচ্ছে। তারা প্রকৃতিকে বদলে নেওয়ার মানবিক ক্ষমতার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে নেই। বরং যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা উন্মোচিত করেছি তার মোকাবিলায় আমাদের শক্তিহীনতা নিয়ে তারা চিন্তিত। একটা অন্য ভাবনাও রয়েছে। সেটা হল, সমুদ্রের নিচে যে গর্তটা হয়েছে, সেটা একটা যান্ত্রিক দুর্ঘটনা বা যন্ত্রের ভেঙে পড়ার থেকে বড়ো ব্যাপার। এটা একটা জীবন্ত বস্তুর শরীরে একটা ভয়াবহ ঘা; এটা আমাদের শরীরেরই অংশ। বিপি-র ক্যামেরায় আমরা সকলে দেখে নিতে পারি পৃথিবীর ভেতরের বস্তুটা থেকে ২৪ ঘন্টা কী নির্গত হয়ে চলেছে।

ওয়াটারকিপার অ্যালায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত এক সংরক্ষণবিদ, জন ওয়াথেন, বিপর্যয়ের প্রথম দিকটায় আকাশপথে তেল নির্গমনের জায়গাটায় গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গুটিকয়েক স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের একজন। তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল পুরু ডোরাকাটা তেলের ধারা ছুটে চলেছে, যেটাকে উপকূলরক্ষীরা ভদ্রভাবে বলেছিল "উজ্জ্বল রামধনু"। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন —— যেটা অনেকেই অনুভব করছে —— "উপসাগর যেন রক্তস্রাব করছে"। এই ছবিটা বারবার আলোচনা ও সাক্ষাৎকারগুলোয় উঠে এসেছে। পরিবেশ অধিকারের

এক আইনজ্ঞ মনিক হার্ডেন নিউ অরলিন্সে বলেন, এই বিপর্যয়কে আমরা "তেল নির্গমন" বলতে নারাজ, ঘটনা হল "আমাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে"। অন্য অনেকে "রক্তপাত বন্ধ করা"র কথা বলেন। আমি নিজে হতবাক হয়ে গেলাম, যখন আমি বিমানে করে ডিপওয়াটার হরাইজন যেখানে ডুবে গেছে, সমুদ্রের সেই অংশটার ওপরে গেলাম, দেখলাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে তেল যে ঘূর্ণির আকার নিয়েছে, তা যেন একটা আশ্চর্য গুহাচিত্রের মতো দেখতে : একটা পলকা ফুসফুস যেন বাতাসের জন্য আকুলভাবে হাঁপাচ্ছে, চোখদুটো ওপরদিকে চেয়ে আছে, যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক পাখি। আমার গভীর অন্তঃস্থল থেকে একটা বার্তা এল।

উপসাগরের উপকূলের কাহিনীতে এটা নিশ্চিতভাবেই একটা আশ্চর্যতম বাঁক, যেন আমাদের চোখ খুলে একটা বাস্তবকে দেখতে বলছে, পৃথিবী কোনদিনই একটা যন্ত্র ছিল না। তাকে মৃত বলে ঘোষণা করার চারশ বছর পর, এত মৃত্যুর মাঝে পৃথিবী জীবন্ত রূপে ফিরে আসছে।

প্রকৃতির মধ্যে তেলের সঞ্চয়ের গতিবিধি অনুসরণ করার অভিজ্ঞতা গভীর বাস্তুবিদ্যা অধ্যয়নের একটা বিষয়। পৃথিবীর এক কোণে যখন একটা বস্তু নিয়ে ভয়ঙ্কর সমস্যা চলে, অন্যত্র অকল্পনীয়ভাবে তা উৎসারিত হয় কোন কোন প্রক্রিয়ায়, প্রতিদিন আমরা তা শিখতে থাকি। একদিন আমরা জানলাম তেল পৌঁছে যেতে পারে কিউবায়, তারপর ইউরোপে। তারপর আমরা শুনতে পাই, আটলান্টিকের ওপর প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, কানাডায় জেলেরা উদ্বিগ্ন, কারণ এখানকার পারে যে ব্লুফিন টুনা তারা ধরেছে, সেগুলো জন্মেছে হাজার হাজার মাইল দূরে তৈলাক্ত উপসাগরের জলে। আমরা আরও জানতে পারি, উপসাগরের উপকূলের জলাভূমি যেন পাখিদের এক ব্যস্ত বিমান বন্দর, প্রত্যেককেই সেখানে এসে দাঁড়াতে হবে : ১১০টি প্রজাতির পরিযায়ী গায়নপাখি এবং আমেরিকার জলচর পাখিদের ৭৫% এখানে আসে।

ব্রাজিলে একটা প্রজাপতি পাখা খুললে টেক্সাসে একটা টর্নেডো ছুটে যায়, এধরনের সংযোগবিহীন ক্যাওস থিয়োরির কথা বলেন তাত্ত্বিকেরা, আমাদের চোখের ওপর আর একটা ক্যাওস থিয়োরি উন্মোচিত হচ্ছে। ক্যারোলিন মার্চেন্ট শিক্ষাটা এভাবে তুলে ধরেছেন, "বিপি এত দেরিতে ও মর্মান্তিকভাবে যে সমস্যাটা আবিষ্কার করেছে — প্রকৃতি একটা সক্রিয় শক্তি — সেই সমস্যাকে ততটা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না"। ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় এমন ফলাফল প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক, বরং "ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এমন ঘটনাই স্বাভাবিক"। যেটা আমরা আগে পাইনি, সেটাই ঘটল ক'দিন আগে। বিপি-র জাহাজের ওপর একটা বিস্ময়বোধক চিহ্নের মতো এমন এক বজ্রপাত ঘটল, সমুদ্রে প্রাচীর তোলার সমস্ত উদ্যোগ তাদের মুলতুবি রাখতে হল। বিপি-র এই বিষাক্ত কার্যকলাপের ওপর কীভাবে এই ঝঞ্ঝা এল, তা কে জানে!

একটা কথা জোর দিয়ে বলা দরকার, আলোকপ্রাপ্ততার এই বিশেষ পথে কিছু অনুপম বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। কথিত আছে, অন্য দেশের ওপর বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা শিক্ষা নেয়। এখন মনে হচ্ছে, আমরা সকলে প্রকৃতির চক্রাকারে আবর্তিত ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষিত হয়ে উঠছি, তার ওপর বিষ প্রয়োগ করে।

১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে কলম্বিয়ার এক আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা বিশ্বজুড়ে হেডলাইন হয়ে উঠেছিল। আন্দিয়ান ক্লাউড ফরেস্টে তাদের বাসভূমি থেকে তারা জানিয়েছিল, অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম তাদের এলাকায় যে ড্রিলিংয়ের পরিকল্পনা করছে, তা যদি বাস্তবায়িত করা হয়, তাহলে তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গণ-আত্মহত্যা করবে। তাদের গোষ্ঠী-প্রবীণেরা ব্যাখ্যা করেছিল, তেল হল রুইরিয়া-র অংশ, "ধরিত্রী মাতার রক্ত"। তারা বিশ্বাস করে, তাদের নিজেদের জীবন এবং সমস্ত জীবন রুইরিয়া থেকে প্রবাহিত। অতএব তেল উত্তোলন তাদের জীবনে ধ্বংস নিয়ে আসবে। (ওখানে যতটা তেল আছে বলে ভাবা হয়েছিল ততটা নেই, এই যুক্তিতে ওই কোম্পানি ওই এলাকা থেকে সরে এসেছিল।)

আসলে সমস্ত দেশীয় সংস্কৃতির পৌরাণিক কথায় সব দেবতা ও আত্মা বাস করে প্রকৃতি জগতে — পাহাড়ে, পর্বতে, হিমবাহে, জঙ্গলে — যেমন তারা ছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের আগের ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে। কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটির এক নৃবিজ্ঞানী, কাটজা নেভিস উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের চিন্তার অভ্যাস একটা প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সাধন করে। যে শক্তিগুলিকে আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব করতে পারি না, ধরিত্রীকে "পবিত্র" বলা তার প্রতি নম্রতা প্রকাশের আর এক উপায়। যখন কোন কিছু পবিত্র, তা দাবি করে আমরা সেখানে সাবধানে এগোই এবং সম্ভ্রম নিয়ে।

দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যদি আমরা এই শিক্ষাকে আত্মস্থ করি, এর তাৎপর্য গভীর হতে পারে। অফশোর ড্রিলিংয়ের প্রতি গণসমর্থন একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে, "এখনই ড্রিল করো" উন্মাদনার চূড়া থেকে নেমে ২২%-এ। তবে বিষয়টা শেষ হয়নি। কিছুটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র, যখন আবার ওবামা প্রশাসন ঘোষণা করবে, অসাধারণ নতুন প্রযুক্তি এবং কড়া নতুন বিধিব্যবস্থাকে ধন্যবাদ, গভীর সমুদ্রে ড্রিল করা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ; এমনকী আর্কটিকে, যেখানে বরফের নিচে সাফাইয়ের কাজ চালানো, উপসাগরে যেটা চলছে তার থেকে অসংখ্য গুণ বেশি জটিল, সেখানেও ড্রিল করা যায়। কিন্তু এবার আর আমরা অত সহজে নিশ্চিত হতে পারব না; যেটুকু এলাকা বেঁচে আছে সেটা নিয়ে অত তাড়াতাড়ি জুয়া খেলতে যেতে পারব না।

ভূবিজ্ঞান নিয়েও একই জিনিস চলছে। আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা যখন সম্পন্ন হতে চলেছে, আমরা ডঃ স্টিভেন কুনিন-এর কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে পাব। তিনি হলেন ওবামার শক্তি-বিজ্ঞান বিষয়ক আন্ডারসেক্রেটারি। আবহাওয়া পরিবর্তনের মোকাবিলায় কিছু প্রযুক্তিগত কৌশল করা যেতে পারে, যেমন বাতাসে সালফেট ও অ্যালুমিনিয়াম কণা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে — অবশ্যই এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ, ডিজনিল্যান্ডের মতোই! এই ধরনের মতের যাঁরা প্রবক্তা, তিনি হলেন তাঁদেরই অন্যতম। ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন বিপি-র প্রধান বিজ্ঞানী। মাত্র ১৫ মাস আগে তিনি বিপি-র তথাকথিত নিরাপদ ডিপওয়াটার ড্রিলিংয়ের প্রযুক্তির দেখাশোনা করেছেন। এবার আর আমরা পৃথিবীর ওপর ভালো চিকিৎসকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথটাকে নিশ্চয় বেছে নেব না। বরং আমাদের ভোগকে কমানোর চেষ্টা করব। চেষ্টা করব যাতে আমরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দিকে সরে আসতে পারি, কারণ তার বিপর্যয় ঘটলে সামান্যই ঘটবে। আমেরিকার কমেডিয়ান বিল মাহের বলেছেন, "আপনারা কী জানেন, একটা উইন্ডমিল সমুদ্রে ভেঙে পড়লে কী হবে? শুধু একটা ছলকানি হবে।"

এই বিপর্যয়ের সবচেয়ে ইতিবাচক সম্ভাব্য ফলাফল কেবল বাতাসের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির গতিবৃদ্ধিই নয়, বরং বিজ্ঞানের সতর্কতার নীতির এক পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি। হেওয়ার্ডের "যদি তুমি জানো তুমি ব্যর্থ হতে পার না" সংস্কারের বিপরীতে সতর্কতার নীতি বলে, "যখন কোন কার্যকলাপ পরিবেশ বা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির বিপদ নিয়ে আসে" আমাদের সাবধানে পা ফেলতে হয়। কারণ বিফলতা সম্ভব এবং তা আসতেই পারে। হেওয়ার্ড যখন ক্ষতিপূরণের চেকগুলোতে সই করবেন, হয়তো আপনি তাঁর ডেস্কের সামনে একটা নতুন ফলক বসিয়ে দিতে পারেন, যাতে লেখা থাকবে, "তুমি যা জানো তাই করো, কিন্তু তুমি জানো না"।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666